বৈষ্ণব প্রদীপ ৬

বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত
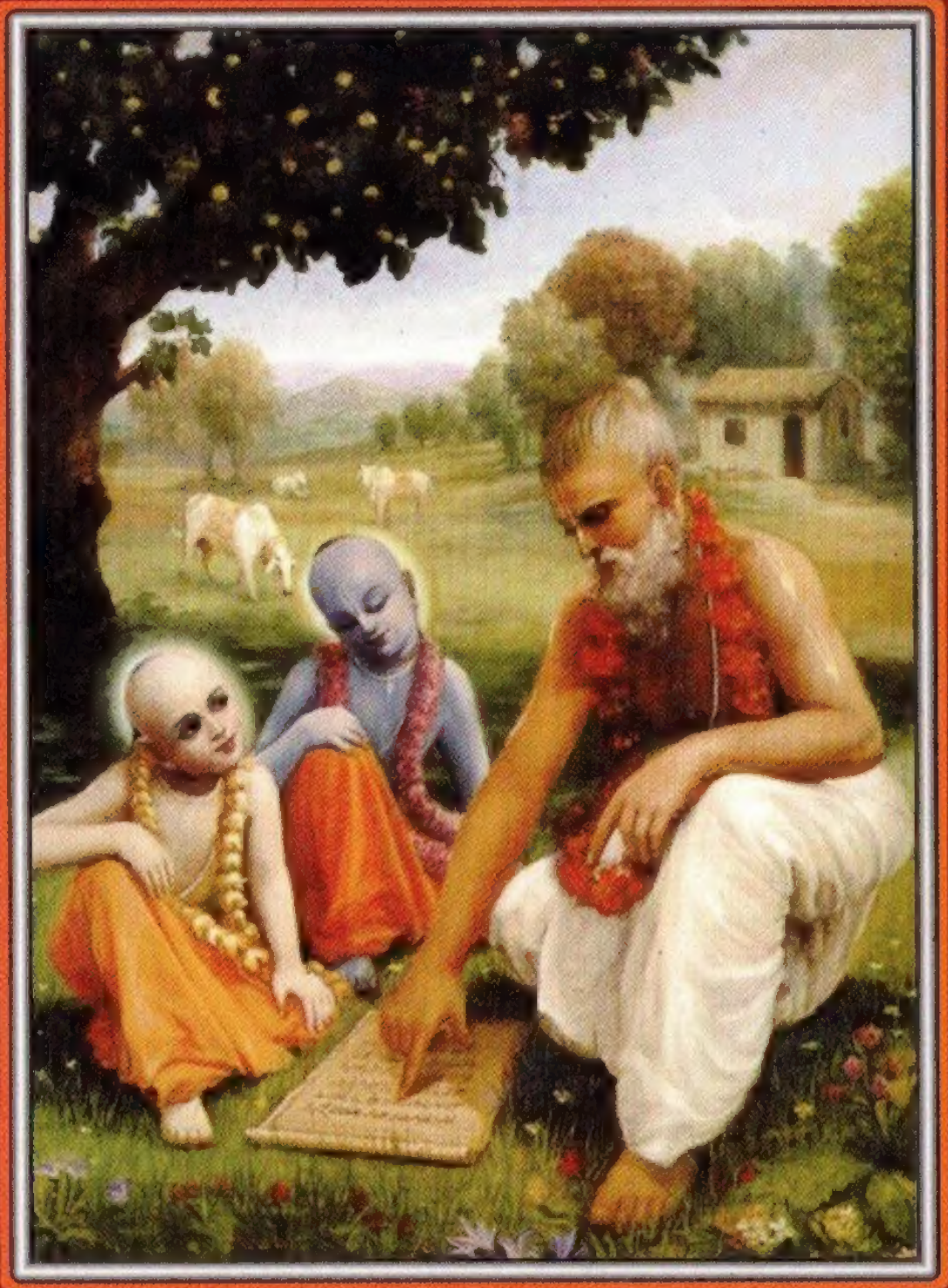
শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

ষষ্ঠ খণ্ড

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১২

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪
০১৬৮১৬৫১৩৫৫

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্‌পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট
পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
শ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী
মহারাজ-এর করকমলে ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বৈষ্ণব প্রদীপ বইটির ষষ্ঠ খণ্ডের অর্থানুকূল্য করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রীচৈতন্য অপ্রাকৃত সংঘ (সি.টি.এস.)। সংঘভুক্ত সবার পরিবারের উপর শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই-এর কৃপা বর্ষিত হউক—এই কামনা রইল।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব
৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১ম খণ্ড
৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ২য় খণ্ড
৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৩য় খণ্ড
১০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৪র্থ খণ্ড
১১. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৫ম খণ্ড
১২. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৭ম খণ্ড
১৪. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৮ম খণ্ড
১৫. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৯ম খণ্ড
১৬. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১০ম খণ্ড
১৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১১তম খণ্ড
১৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১২তম খণ্ড
১৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১৩তম খণ্ড
২০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১৪তম খণ্ড

পরবর্তী বই

১. মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
২. মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা
৩. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
৪. মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল
৫. সর্বোত্তম অর্থনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ
৬. সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ন্তনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয় নাই। যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার ফসল এই বইটি। আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও

পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের আলোকে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী, ভক্তপ্রবর শ্রী শ্যামল চন্দ্র শীল, ভক্তপ্রবর শ্রী দিলীপ কুমার বল, ভক্তপ্রবর শ্রী রঞ্জিত কুমার মজুমদার অন্যতম।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে

প্রশ্ন : ৮৭১ ॥ ভগবানের প্রসাদ সেবনের ফলে কি লাভ হয়?
উত্তর : ভগবানের অধরামৃতকেই প্রসাদ বলা হয়। এতে ভগবানের কৃপা সরাসরি যুক্ত থাকে। এই প্রসাদ সেবনে মানুষের মন নির্মল হয়। সে তখন আস্তে আস্তে ভগবৎমুখী হয়ে পড়ে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে "ভগবানের শ্রীবিগ্রহ থেকে সামান্য দূরে অবস্থান করে যে মানুষ তুলসী এবং চরণামৃতযুক্ত ভগবানের প্রসাদ সবসময় সেবন করেন তিনি তৎক্ষণাৎ কোটী কোটী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূণ্য অর্জন করেন।"

প্রশ্ন : ৮৭২ ॥ ভগবানের চরণামৃত কি? চরণামৃত পান করলে কি ফল লাভ হয়?

উত্তর : ভগবানকে বিভিন্ন রূপে সজ্জিত করার আগে যে স্নান করানো হয় সেই স্নানের জল হল চরণামৃত। বিভিন্ন গন্ধ ও ফুলসহ স্নানের জল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বেয়ে নিচে নেমে আসে। এই জল এক পাত্রে সংগ্রহ করে তার সঙ্গে দই মিশানো হয়।

চরণামৃত অতি মধুর সুস্বাদু হয়। এতে যথেষ্ট পারমার্থিক মাহাত্ম্য নিহিত থাকে।

পদ্মপুরাণ অনুযায়ী যে লোক কোনদিনও দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (শাস্ত্র পাঠ করা বুঝায়) অর্চ্চন ইত্যাদি কোন ধরনের পূণ্য কর্ম করে নাই সেও যদি মন্দিরে গিয়ে ভগবানের চরণামৃত পান করে তবে সে ভগবানের পরম ধামে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করে।

প্রশ্ন : ৮৭৩ ॥ ভগবানকে নিবেদিত ধুপ এবং ফুলের ঘ্রাণ নিলে কি ফল লাভ হয়? এ বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : হরি ভক্তি-সুধোদয় নামক বইতে বলা হয়েছে যে "কোন বিশেষ ওষধি (গাছ) আঘ্রাণ করলে যেমন সাপের বিষ কেটে যায় তেমনি ভগবানকে নিবেদিত সুগন্ধি ফুল আঘ্রাণ করলে জড় বিষয়ের বিষময়ী প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

কোন লোক যখন মন্দিরে এসে ভগবানকে অর্পিত সুগন্ধি ফুল ও ধুপ আঘ্রাণ করেন তখন তিনি সব ধরনের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

কিছু তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, "ভগবানকে নিবেদিত ফুলের মালার গন্ধ যখন কোন মানুষের নাকে প্রবেশ করে তিনি তৎক্ষণাৎ তার সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তে পরিণত হতে পারেন।" এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমন চতুঃসন কুমারগণ ছিলেন প্রথমে নির্বিশেষবাদী। কিন্তু ভগবানকে নিবেদিত সুগন্ধি ফুল আঘ্রাণ করার ফলে তাঁরা ভগবানের ভক্তে পরিণত হন।

প্রশ্ন : ৮৭৪ ॥ যে কোন লোক কি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের চরণ বা পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারেন?

উত্তর : বিষ্ণু ধর্মোত্তর শাস্ত্রে শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্ম স্পর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যে মানুষ বৈষ্ণবীয় দীক্ষায় দীক্ষিত এবং কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত থেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র তিনিই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকারী।"

বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী শূদ্র, চণ্ডাল ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ তাদের অশুদ্ধ আচরণের জন্য, বর্ণের জন্য নয়। তবে বৈদিক শাস্ত্রে আবার বলা হয়েছে এরূপ নিচু কুলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরাও যদি শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভগবৎ ভক্তির অনুশীলন করা আরম্ভ করে তবে তারা সব ধরনের কলুষ মুক্ত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে ভগবানের চরণস্পর্শ লাভের অধিকারী হতে পারবে।

প্রশ্ন : ৮৭৫ ॥ ভগবানের আরতি দর্শন করলে কি ফল লাভ হয়?

উত্তর : আরতির সময় ভগবানের পাদপদ্ম থেকে আরম্ভ করে বৈদিক নিয়ম অনুযায়ী তার মুখমণ্ডল পর্যন্ত ঘৃতসংযুক্ত সলতে জ্বালানো প্রদীপ দেখানো হয়। ভগবানের আরতি সম্পর্কে স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে "যদি কেউ আরতির সময় ভগবানের শ্রী মুখমণ্ডল দর্শন করেন তাহলে তিনি কোটী কোটী জন্মের সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হন। এমনকি তিনি ব্রহ্ম হত্যার মত জঘন্যতম পাপ থেকেও মুক্ত হন।"

প্রশ্ন : ৮৭৬ ॥ ভগবানের মহিমা ও যশ শ্রবণ করলে কি ফল লাভ হয়?

উত্তর : ভগবানের নাম, মহিমা ও যশের কথা শ্রবণ করা হল ভগবৎ ভক্তির প্রথম স্তর। ভগবৎ ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য শ্রবণ হল অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যখন ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা শ্রবণ করেন তখন তিনি অতি তাড়াতাড়ি পবিত্র হন এবং তাঁর হৃদয় কলুষমুক্ত হয়।

গরুড় পুরাণে শ্রবণের মহিমা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক একটি সর্পদংশনে অচেতন মানুষের মতো। কারণ এই দুই অচেতন অবস্থাই মন্ত্রের প্রভাবে নিরাময় হতে পারে।" যেমন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে যে কেউ মৃতপ্রায় অচেতন অবস্থা থেকে পুণরায় কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনে ফিরে আসতে পারে।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেও বলা হয়েছে যে শ্রবণের ফলে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২/৩১৫) বলা হয়েছে "যে লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভের প্রত্যাশী তার কর্তব্য হল সবসময় ভগবানের গুণাবলী শ্রবণ করা। এর ফলে অবশ্যই তার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর হয়।"

প্রশ্ন : ৮৭৭ ॥ ভগবানের ধ্যান বলতে কি বুঝায়? এর মাহাত্ম্য কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির চিন্তায় মনকে একান্তভাবে নিয়োজিত করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়াকে ধ্যান বলা হয়। রূপহীন ও গুণহীন কোন কিছুর কল্পনা করা অথবা শুন্যের কল্পনা করা ধ্যান নয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ধ্যানের অর্থ হল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ করা।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে ধ্যানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন **নৃসিংহ পুরানে** বলা হয়েছে, "ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান জড়জগতের সুখ-দুঃখ অনুভূতির অতীত চিন্ময় অবস্থা। এই ধ্যানের প্রভাবে মহাপাপিষ্ঠ ব্যক্তিও তার পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে।"

বিষ্ণু ধর্মে ভগবানের দিব্য গুণাবলির ধ্যান সম্পর্কে বলা হয়েছে "যে সব লোক সবসময় কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত এবং যারা নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলির কথা স্মরণ করেন তাঁরা অচিরেই সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হন এবং এরূপভাবে পবিত্র হয়ে তাঁরা ভগবৎধামে প্রবেশ করার যোগ্য হন।"

পদ্মপুরাণে ভগবানের লীলা স্মরণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে "যে মানুষ সব সময় ভগবানের অমৃতময় লীলা ও অলৌকিক কার্যকলাপের চিন্তায় সব সময় নিমগ্ন তিনি অবশ্যই সব ধরনের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।"

প্রশ্ন : ৮৭৮ ॥ দাস্যভাব বলতে আসলে কি বুঝায়? দাস্যভাবের ভক্তের কিছু উদাহরণ দিন।

উত্তর : সাধারণ অর্থে সকাম কর্মীদের মতো কর্মফল ভগবানকে অর্পন করাকে দাস্যভাব বলা হয়। তবে শ্রীরূপ গোস্বামীসহ অপরাপর আচার্যদের মতে কোন না কোনভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকাই হল দাস্যের স্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবান হলেন আসল প্রভু এবং আমি হলাম তাঁর দীনহীন সেবক, এরূপ মনোভাবকেই আসলে দাস্যভাব বলা হয়।

দাস্যভাবের ভক্ত হিসাবে শ্রীরাম চন্দ্রের ভক্ত হনুমানের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও নন্দ মহারাজের ভৃত্য রক্তক এবং পত্রকও ভগবান কৃষ্ণের দাস্যভাবের ভক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন : ৮৭৯ ॥ ভগবৎ মন্দিরে কি কারও শয়ন করা উচিত?

উত্তর : শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের মন্দিরে কারও শয়ন করা উচিত নয়। তবে কখনো কখনো দেখা যায় কোন শুদ্ধ ভক্ত অন্তরঙ্গ সখারূপে ভগবানের সেবা করার জন্য ভগবানের মন্দিরে শয়ন করেন। ভক্তের এই সখ্য ব্যবহারকে রাগানুগা বা স্বতঃস্ফুর্ত ভগবৎ ভক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন : ৮৮০ ॥ ভগবানে আত্মনিবেদন কথাটীর অর্থ কি?

উত্তর : ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতিকেই আত্মনিবেদন বলা হয়। আত্ম কথাটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন কোন সময় আত্ম বলতে আত্মাকে বুঝানো হয়। আবার কখনো মন অথবা দেহকে বুঝায়। তাই পূর্ণ আত্মনিবেদন বলতে কেবল আত্মাকে নিবেদন বুঝায় না। ভগবানের সেবায় দেহ এবং মনকেও সমর্পণ করা বুঝায়। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়—

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর
অর্পিল তুয়া পদে, নন্দ কিশোর ॥

এককথায় ভগবৎ চরণে নিজেকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করার নামই আত্মনিবেদন।

সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিবেদন সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২৯/৩৪) ভগবান বলছেন, "যে মানুষ সর্বতোভাবে আমার চরণে আত্মনিবেদন করে অন্য সব ধরনের কর্ম ত্যাগ করে, ইহলোক এবং পরলোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে রক্ষা করি।" এই ধরনের মানুষ ইতিমধ্যেই সার্ষ্টি নামক মুক্তি (ভগবানের মতো সমান ঐশ্বর্য্য) লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে।

শ্রীমদ ভগবদ্ গীতাতেও ভগবান বলেছেন সব ধরনের জড় জাগতিক ধর্ম ত্যাগ করে কেউ তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করলে তিঁনি

তাঁর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত করেন।

প্রশ্ন : ৮৮১ ॥ অনেকে বলেন ভক্তিপথে উন্নতি সাধনের জন্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য হল দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এরূপ কথা কি সঠিক?

উত্তর : আসলে এরূপ কথা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করার জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলন অনুকূলভাবে কেবল প্রাথমিক স্তরেই কাজ করে। চরমে এই সবও ত্যাগ করতে হয়। কারণ ভগবৎ ভক্তি ভগবানের সেবার প্রতি অনুরাগ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি নির্ভরশীল নয়। এককথায় ভগবৎ ভক্তি লাভের অন্য ঐকান্তিক অনুরাগ ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন "ভক্তির মাধ্যমেই কেবলমাত্র আমাকে জানা যায়।" শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২০/৩১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "হে উদ্ধব যে সব মানুষ একান্তভাবে আমার সেবায় যুক্ত তারা জ্ঞানের প্রয়াস ও বৈরাগ্যকে অনুকূল বলে মনে করে না। কেউ যখন আমার ভক্ত হয় তখন আপনা থেকেই সে জড়জাগতিক সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয় এবং পরমতত্ত্ব উপলব্ধির বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।"

প্রশ্ন : ৮৮২ ॥ বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকেই জড় সভ্যতার প্রগতির নিন্দা করেন। তাহলে তাঁরা টেপ রেকর্ডার, মাইক্রোফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট, বিমান ইত্যাদির মতো জড় সভ্যতারদান প্রাকৃত বস্তুগুলো ব্যবহার করছেন কেন?

উত্তর : যা দ্বারা ভগবান ও ভক্তের সেবা করা যায় তেমন কোন বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এটাই ভগবৎ ভক্তির এক ধরনের রহস্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য তাই জড়জাগতিক বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার করা যায় এবং এজন্য এসব বস্তু আবিষ্কার এবং ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিভঙ্গী হল এসব কিছু যেন কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হয়।

প্রশ্ন : ৮৮৩ ॥ অহিংস এবং নিরামিষভোজী হলেই কি ভগবদ্ ভক্ত হওয়া যাবে?

উত্তর : অভ্যাসের মাধ্যমে নিরামিষ ভোজী এবং অহিংস হওয়া জড়জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে সদগুণ বলা যায়। কিন্তু এই সব গুণগুলিই মানুষকে ভগবৎ ভক্ত করতে পারে না। নিরামিষভোজী অথবা অহিংস হলেই ভগবৎ ভক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ভগবৎ ভক্ত নিঃসন্দেহে নিরামিষ ভোজী এবং অহিংস হন।

প্রশ্ন : ৮৮৪ ॥ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—ভক্তির এই নয়টি অঙ্গের মধ্যে যেকোন একটি অনুশীলন করলে কি ভগবৎ ভক্তি লাভ করা যাবে? এই বিষয়ে কি কোন উদাহরণ রয়েছে?

উত্তর : ভক্তির উপরোক্ত নয়টি সাধন অঙ্গের প্রতিটি এতই শক্তিশালী যে কেউ যদি এর একটিরও অনুশীলন করেন তাহলে তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন। এই কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভক্তির উপরোক্ত নয়টি অঙ্গের মধ্যে একটি করে সাধন করার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে লক্ষ্মীদেবী, অর্চনে পৃথু মহারাজ, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি মহারাজ। আবার অম্বরীষ মহারাজ ভক্তির সব কয়টি অঙ্গ অনুশীলন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৮৮৫ ॥ রাগানুগা ভক্তি কি?

উত্তর : শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে শ্রী ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে, তার চিন্তায় পুরাপুরিভাবে নিমগ্ন হয়ে, তার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের আকুলতায় যখন ভগবৎ ভক্তি সাধিত হয় তখন তাকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। ভক্তি সম্পর্কে তাঁদের কোন শিক্ষা লাভ বা অনুশীলন করতে হয় না। রাগানুগা ভক্তি দুইভাগে বিভক্ত : একটি হল কামরূপা এবং অপরটি সম্বন্ধরূপা।

প্রশ্ন : ৮৮৬ ॥ কামানুগা ভক্তি কি?

উত্তর : শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপীকাদের অথবা দ্বারকা ধামের শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের পথ অনুসরণ করে ভগবানের যে সেবা করা হয় তাকে কামানুগা ভক্তি বলা হয়। এরূপ ভগবৎ ভক্তিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় : একটি হল স্বকীয়া এবং অন্যটি হল পরকীয়া। উভয় ক্ষেত্রেই গোলোক-বৃন্দাবনে মধুররসে অভিষিক্ত ভগবানের সেবায় নিয়োজিত কোন বিশেষ গোপীর অনুগামী হতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সাথে মধুররসে সরাসরি যুক্ত হওয়াকে কেলি বলা হয়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করে যারা বৈধী ভক্তির অনুশীলন করছেন—বিশেষ করে মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনা করছেন তাদের হৃদয়েই কেবল কামানুগা ভক্তির প্রকাশ হয়। উল্লেখ্য যে কেউ যদি প্রেম ভক্তিতে ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, অথচ গোপীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন তবে তিনি দ্বারকায় উন্নীত হয়ে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন মাত্র।

প্রশ্ন : ৮৮৭ ॥ কেউ যদি বাৎসল্য রস আস্বাদনের জন্য নিজেকে নন্দ মহারাজ অথবা যশোদামাতা রূপে কল্পনা করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন তবে কি তা ভুল হবে?

উত্তর : ভগবানের সঙ্গে পিতা অথবা মাতা সম্পর্ক স্থাপনের দুইটি উপায় আছে। একটি উপায় হল সরাসরিভাবে ভগবানের পিতা বা মাতা হওয়ার চেষ্টা করা এবং অপরটি হল নন্দ মহারাজ বা যশোদা মাতার অনুগামী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বা মাতা হওয়ার আদর্শ স্থাপন বা বিকশিত করা। শাস্ত্র অনুযায়ী প্রথম উপায় সঠিক নয়। কারণ এই ধরনের চেষ্টা মায়াবাদ দ্বারা কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

স্কন্দ পুরাণে পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুর নিবাসী এক বৃদ্ধের কাহিনী রয়েছে। ঐ বৃদ্ধ তার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেছিলেন। নারদ মুণি তখন ঐ বৃদ্ধকে নন্দ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন এবং এর ফলে তার মনের বাসনা পুরণ হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৮৮৮ ॥ বৈষ্ণব মহাজন বল্লভ আচার্য ভক্তি লাভের ক্ষেত্রে পুষ্টিমার্গের কথা বলেছেন। এই পুষ্টিমার্গ কি?

উত্তর : কিছু মানুষ আছেন যারা সবসময় তাদের পতিরূপে, সখারূপে, পিতারূপে অথবা শুভাকাঙ্খীরূপে ভগবানের কথা চিন্তা বা স্মরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্তে প্রেম কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপার প্রভাবেই প্রকাশিত হতে পারে। ভগবৎ ভক্তির এই পন্থাকে কখনো কখনো পুষ্টিমার্গ বলে অভিহিত করা হয়। পুষ্টি শব্দের অর্থ হল পুষ্টিকর এবং মার্গ শব্দের অর্থ পথ। এই ধরনের ভক্তিভাব বিকাশিত হলেই সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তি লাভের পুষ্টি সাধন হয়। তাই তাকে বলা হয় পুষ্টিমার্গ। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় এবং বল্লভ সম্প্রদায় এরূপ পুষ্টিমার্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

প্রশ্ন : ৮৮৯ ॥ অনেক সময় দেখা যায় কোনরকম ভক্ত্যাঙ্গের অনুশীলন না করা সত্ত্বেও কেউ হঠাৎ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করেছেন। এর কারণ কি?

উত্তর : কোন কোন মানুষের মধ্যে ভগবৎ ভক্তির এই হঠাৎ প্রকাশ অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের বিশেষ কৃপা বলে বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আকস্মিকভাবে এই ভাবভক্তির প্রকাশকে শাস্ত্রে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. বাচিক ২. আলোকদান এবং ৩. হার্দ্য।

বাচিক বা কেবলমাত্র কথাবলার মাধ্যমে ভাবভক্তি বিকাশের একটি বর্ণনা নারদীয় পুরাণে আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নারদমুনিকে বলছেন "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি তোমার মঙ্গলময়, পূর্ণ-আনন্দময়ী এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রকাশিত হোক।"

আলোকদান—অর্থাৎ কেবল দৃষ্টির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি লাভের উদাহরণ স্কন্দ পুরাণে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে "জঙ্গল প্রদেশের মানুষরা যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন তখন বিগলিত চিত্তে তারা এতটাই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন যে তারা শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না।"

হার্দ্য সম্পর্কে শুক সংহিতায় নারদ মুণি শ্রীল ব্যাসদেবকে বলেছেন, "হে বাদরায়ন! তোমার মহা ভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে বহু জন্ম-জন্মান্তরে সাধনার ফলে যে বিষ্ণু ভক্তি লাভ করা যায় তা বিনা সাধনাতেই তার চিত্তে উদিত হয়েছে।"

আবার শুদ্ধ ভক্তের কৃপা হেতুও অনেক সময় উপরোক্ত ধরনের ভগবৎ ভক্তি লাভ হয়। যেমন স্কন্দ পুরাণ থেকে দেখা যায় নারদ মুণির বিশেষ কৃপার ফলে নিচ কুলের এক ব্যাধও ভগবানের মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৮৯০ ॥ ভগবৎ ভক্তদের জড় বিষয়ে অনাসক্তি থাকে। এই অনাসক্তি বলতে কি বুঝায়? এর শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিন।

উত্তর : মানুষের জড় ইন্দ্রিয় সবসময়ই ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের কামনা করে। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্যভাবের উদয় হয় তখন তার ইন্দ্রিয়সমূহ আর তাকে জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। মনের এই অবস্থাকে অনাশক্তি বলা হয়।

শ্রীমদ্ ভাগবতে (৫/১৪/৪৩) এরূপ বৈরাগ্য বা অনাসক্তির একটি সুন্দর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়—ভরত মহারাজের চরিত্রে। এই মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের সৌন্দর্যে এতটাই আকৃষ্ট হন যে যৌবনেই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য ইত্যাদি সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকেও দেখা যায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার যৌবনকালেই ভগবান গৌরহরির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অতি সুন্দরী স্ত্রী, পিতামাতা, বিশাল জমিদারীর আয় ইত্যাদি ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

বিষয়-বাসনার প্রলোভন থেকে গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করে নির্জনে কৃত্রিমভাবে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যথার্থ অনাসক্তি বা বৈরাগ্য নয়। নানা রকম প্রলোভনের মধ্যেও কেউ যদি জড় বিষয়ে আকৃষ্ট না হন তিনিই হলেন বিষয়ে যথার্থ বৈরাগী বা অনাসক্ত।

প্রশ্ন : ৮৯১ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অমানীকেও মান দেওয়ার জন্য বলেছেন। এই অমানী বলতে কাদের বুঝানো হয়?

উত্তর : কোন লোক যখন ভগবৎ তত্ত্ব লাভের সবধরনের গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনরকম গর্ব অনুভব করেন না তখন তাঁকে বলা হয় অমানী। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় মহারাজ ভগীরথের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এমন প্রীতিপূর্ণ ভাবের উদয় হয়েছিল যে তিনি সব কিছু ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। একসময় লালাবাবু নামের কলিকাতার একজন বিখ্যাত জমিদার তাঁর বহু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে ভগবানের দাসত্ব বরণ করে বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। তিনিও মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। ভক্ত ভগবানের জন্য সব ধরনের অবমাননা, লাঞ্চনা, গঞ্জনা হাসিমুখে সহ্য করেন। ভগবানের সেবার জন্য ভক্ত অতি তুচ্ছ পদও গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করেন না।

প্রশ্ন : ৮৯২ ॥ অহংগ্রহোপাসনা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কোন মানুষ যখন নিজেকেই পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে ভগবানের মতো পুজা লাভ করতে চায় সেই ভাব বা আকাঙ্খাকে বলা হয় অহংগ্রহোপাসনা। আত্ম-উপলব্ধির এই অবস্থার নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে তারা ভগবানের থেকে অভিন্ন। এইভাবে তারা মনে করে যে তাদের নিজেদের পুজার মাধ্যমেই তারা পরমেশ্বরের পুজা করছে। এরূপ মনোভাব অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ।

প্রশ্ন : ৮৯৩ ॥ শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম কাকে বলা হয়?

উত্তর : প্রত্যেক ভক্তই কোন একটি বিশেষ রসে শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন। এই বিশেষ রসে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসার বাসনা অত্যন্ত তীব্র হয় তখন তাকে শুদ্ধ প্রেম বলা হয়।

প্রথম স্তরে ভক্ত শ্রী গুরুদেবের আদেশে বৈধী ভক্তি অনুসরণে তৎপর হন। এই সাধনার মাধ্যমে তিনি যখন সব ধরনের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন তখন ভগবৎ ভক্ত পরায়ন হওয়ার প্রতি রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। এই রুচি ও আসক্তি যখন কালক্রমে ধীরে ধীরে দৃঢ় হয় তখন তা প্রেমরূপ ধারণ করে। নারদ পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কাম এবং মমতা যখন পুরাপুরি প্রকাশিত হয় তখন তাকে

শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বলা হয়। এই শুদ্ধ প্রেম দুইভাবে লাভ করা যায়—চিন্ময় ভাবযুক্ত হওয়ার ফলে এবং স্বয়ং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে।

প্রশ্ন : ৮৯৪ ॥ মথুরাপুরী অবরোধ করা সত্ত্বেও কেন শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে নিজে হত্যা করেন নাই?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে ক্ষত্রিয় রাজাদের ম্লেচ্ছদের স্পর্শ করা উচিত নয়। এমনকি তাদের হত্যা করার সময়ও নয়। তাই ম্লেচ্ছ রাজা কালযবন যখন মথুরা অবরোধ করে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের হাতে হত্যা করা সমীচীন হবে না বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু তাকে হত্যা করা প্রয়োজন ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ সুক্ষবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মহারাজ মুচুকুন্দের মাধ্যমে ভস্মীভূত করার ব্যবস্থা নেন।

প্রশ্ন : ৮৯৫ ॥ ভক্তের ভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন?

উত্তর : ভক্তের ভাব অনুযায়ী ভগবান পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ—এই তিনরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। সব ধরনের গুণাবলিসহ তিনি যখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন মহাজ্ঞানী তত্ত্ববিদেরা তাঁর সেই রূপকে পূর্ণতম বলেন। যখন তিনি তাঁর সমস্ত গুণ থেকে কিছু কম গুণসহ স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণতর। আরও কম গুণসহ তাঁর প্রকাশিত স্বরূপকে পূর্ণ বলা হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তিনস্তরে নিজেকে প্রকাশ করেন। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, দ্বারকায় পূর্ণতর এবং মথুরায় পূর্ণ।

প্রশ্ন : ৮৯৬ ॥ মহাবিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর : মহাবিষ্ণু হলেন প্রাকৃত জগতের সমস্ত অবতারের উৎস। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আরও বেশি ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং মহত্ত্বপূর্ণ। তিনি মহাবিষ্ণুরও উৎস। এই তত্ত্ব ব্রহ্ম সংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, "মহাবিষ্ণু যাঁর অংশ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

মহাবিষ্ণুর সুবিশাল রূপ হল অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস। অগনিত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নিঃশ্বাস থেকে নির্গত হয় এবং সেগুলো আবার তাঁর

প্রশ্বাসের সঙ্গে নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই মহাবিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ অর্থাৎ কলা।

প্রশ্ন : ৮৯৭ ॥ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মতো সৎ, চিৎ আনন্দ ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যারা প্রেমময়ী সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারেন তাঁদেরকে বলা হয় নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত কখনো ভগবানকে ভুলে না গিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত থাকেন। সব ব্রজবাসী এবং দ্বারকাবাসীরা—অর্থাৎ গোপ এবং যদু বংশীয়রা ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন তখন তাঁর লীলার সহায়তার জন্য এই সব ভক্তগণ তাঁর সাথে এখানে আসেন। তাঁরা বদ্ধজীব নন, সকলেই নিত্যমুক্ত ভগবৎ পার্ষদ।

প্রশ্ন : ৮৯৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বয়স কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এসব বলতে কি বুঝায়? এসব বয়সে তিনি কি কি লীলা করেছেন?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয় কৌমার। ছয় থেকে দশ বৎসর বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড। এগার থেকে পনের বৎসর বয়সকে বলা হয় কৈশোর। ষোল বছর থেকে শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে প্রবেশ করেন। তারপর তাঁর আর বয়সের কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রধানত কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর অবস্থায় দেখা যায়। নন্দ-যশোদার সাথে তাঁর বাৎসল্য লীলা কৌমার অবস্থায় প্রকাশিত হয়। গোপসখাদের সঙ্গে সখ্যরসের প্রকাশ পৌগণ্ড অবস্থায় এবং গোপীদের সাথে তাঁর মধুর প্রেম বিলাস কৈশোর অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : ৮৯৯ ॥ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত কি ধরনের পোষাক পরিধান করতেন?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের দেহে সাধারণত চার ধরনের পরিধান থাকে। কুর্তা, উষ্ণীষ, কটিবন্ধ এবং ধুতি। বৃন্দাবনে তিঁনি রক্তিম বসন, সোনালী কুর্তা, আর কমলা রংয়ের উষ্ণীষ (পাগড়ি) পরিধান করতেন।

প্রশ্ন : ৯০০ ॥ বৈজয়ন্তী মালা কৃষ্ণ পরিধান করেন। এই মালা কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গলায় বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন। কমপক্ষে পাঁচ রকমের ফুল দ্বারা যে মালা তৈরী করা হয় তাকে বৈজয়ন্তী মালা বলা হয়। এই মালা সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের হাঁটু অথবা চরণ স্পর্শ করে।

প্রশ্ন : ৯০১ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে কেন বনমালীও বলা হয়?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকে কোন কোন সময় বনমালী বলা হয়। ফুল এবং মালায় তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ বিভূষিত থাকার জন্য তাঁকে বনমালী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই এই রকম বেশ ভুষায় সজ্জিত ছিলেন না। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও তিনি একইভাবে সজ্জিত ছিলেন।

প্রশ্ন : ৯০২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কত ধরনের বাঁশি ব্যবহার করতেন?

উত্তর : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন ধরনের বাঁশি ব্যবহার করতেন। এদের নাম ছিল বেনু, মুরলী এবং বংশী। বেনু অত্যন্ত ছোট ধরনের বাঁশী। এটি ছয় ইঞ্চির বেশি দীর্ঘ নয় এবং এতে ছয়টি ছিদ্র থাকে। মুরলীর দৈর্ঘ প্রায় আঠার ইঞ্চি। এর একপ্রান্তে একটি ছিদ্র থাকে এবং তার গায়ে চারটি ছিদ্র থাকে। এই মুরলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর সুর সৃষ্টি করতে পারে। বংশী প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা এবং তাতে নয়টি ছিদ্র থাকে।

প্রশ্ন : ৯০৩ ॥ আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন জীবের কি করা কর্তব্য?

উত্তর : এরূপ প্রশ্ন পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রীল শুকদেবের নিকট করেছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের ২য় স্কন্দের ১ম অধ্যায় থেকে দেখা যায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন জীবের জন্য প্রথমে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণের কথা বলেছেন। শেষে বলেছেন নাম কীর্তনের উপরই বেশি জোর দিতে হবে।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাদির স্মৃতি জীবের অশেষ পাপ হরণ করেন সত্য কিন্তু তাহা বহু আয়াস সাধ্য। নাম সংকীর্তন কেবল ঠোটের মাধ্যমে করা যায়। এজন্য সর্ব সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তির উচিত

ভগবানের মহামন্ত্র অবিরত জপ করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজর্ষি খট্টাঙ্গ নিজের পরমায়ুর পরিমান জানতে পেরে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ত্যাগ করে হরির শ্রীচরণারবিন্দে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৯০৪ ॥ সাত্ত্বিকভাব কাকে বলে? এর কি কি লক্ষণ আছে?

উত্তর : ভক্ত যখন সাক্ষাৎভাবে বা সামান্য একটু ব্যবধানে থেকে কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হন তখন তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকভাব। এরূপ ভাবের আটটি লক্ষণ আছে : স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রুধারা এবং প্রলয়।

প্রশ্ন : ৯০৫ ॥ নৈমিষারণ্যে শ্রীল সুত গোস্বামী ষাট হাজার মুণি-ঋষিদের সভায় শ্রীমদ্ ভাগবত কীর্তন করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল সুত বলতে কাদের বুঝানো হয়?

উত্তর : প্রাচীন ভারতে সূত নামে একশ্রেণীর শ্রুতিধর এবং সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন। এঁরা কোন কিছু একবার মাত্র শুনেই সেই সব কথা মনে রাখতে পারতেন। ভাগবত কীর্তনকারী শ্রীল সূত গোস্বামী এমনই একজন শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত শোনান সেখানে একজন শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রুতিধর বলে তাঁর পক্ষে তাই সমস্ত কিছু আত্মস্থ করা সম্ভব হয়। এর ফলেই তিনি নৈমিষারণ্যে সমবেত মুণি-ঋষিদেরকে পুণরায় ভাগবত শ্রবণ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৯০৬ ॥ পুরাণ শাস্ত্র কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : পুরাণ শাস্ত্রে ভারতের অতি প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছোট ছোট বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আবার প্রত্যেক রাজসভায় একজন মাগধ—অর্থাৎ State Historian থাকতেন যারা রাজার বংশ পরিচয় এবং কীর্তিকলাপ কীর্তন করতেন। এছাড়া সূত নামে একশ্রেণীর শ্রুতিধর এবং সত্য পরায়ণ লোক ছিলেন। এসব লোক কোন কিছু একবার মাত্র শুনেই সেই সব মনে রাখতে

পারতেন। সূতেরা বিভিন্ন মাগধের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান ও পণ্ডিতদের সভায় সেইসব কথা ও কাহিনী শোনাতেন। এইসব সূতের কাহিনী একত্রিত করে পুরানের সৃষ্টি হয়েছে। তাই পুরাণ হল প্রাচীনকালের ভারতের ইতিহাস।

প্রশ্ন : ৯০৭ ॥ পুরাণের বিষয়বস্তু কি?

উত্তর : পুরাণের বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত শ্লোক থেকেই অনেকটা বুঝা যাবে।

সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি-চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণাং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

(পুরাণ প্রবেশ-২)

সর্গ-অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিসর্গ—অর্থাৎ প্রলয়, বংশ শব্দে রাজা, ঋষি, প্রধান প্রধান ব্যক্তি, দেবতা, দৈত্য, ইত্যাদির বংশের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলোপ বোঝায়। মন্বন্তর অর্থে সময় নির্দেশ করা হয়েছে। এইসব—অর্থাৎ কোন্ ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটেছে। এখন আমরা খৃস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শতাব্দী ইত্যাদির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করি। পুরাণ কারেরা সেই রকম মনুকাল, যুগ ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় নির্দেশ করেছেন। বংশানুচরিত অর্থে বিখ্যাত রাজা এবং বিশেষ ব্যক্তিদের জীবন-চরিত এবং কোন্ কোন্ সময়ে ঐ সব ঘটনা ঘটেছে তার সময়-নির্দেশ থাকে।

পুরাণকে অবিনাশী করার জন্য একসময় পুরাণকারেরা ধর্মের আশ্রয় নেন। কারণ যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন সে কোন না কোন ধর্মকে আশ্রয় করে থাকবে। ফলে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রে রূপান্তর হয়। বেদ, উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাবরাশি সাধারণের ভাষায়, গল্পের আকারে পুরাণে জুড়ে দেওয়া হয়।

কাজেই দেখা যায় শ্রীল ব্যাসদেব সব সূতের বিবরণ, রাজা ও ধর্মীয় নেতাদের কাহিনী এবং দেশের প্রচলিত কিংবদন্তী ইত্যাদি একত্রিত এবং সম্পাদনা করে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন।

প্রশ্ন : ৯০৮ ॥ শ্রীল ব্যাসদেব পদ্ম পুরাণ প্রথমে এবং সবশেষে ভাগবত পুরাণ রচনা করেন। তাহলে পদ্মপুরাণে ভাগবতের পরিচয় থাকা কি করে সম্ভব হয়?

উত্তর : শ্রীল ব্যাসদেব যে ক্রমে পুরাণ রচনা করেছেন তা পুরাণবক্তা সূত গোস্বামী উল্লেখ করেছেন। সূত যখন পুরাণ কথা বলেছেন তখন ব্যাসদেবের সমস্ত পুরাণই রচনা করা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : ৯০৯ ॥ পুরাণশাস্ত্রের সময়কাল কত?

উত্তর : পুরাণ মতে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে আরম্ভ হয়। কাজেই খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরাণকাল বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন : ৯১০ ॥ অনেক দুর্মতিজন বলেন ভাগবত নাকি ব্যাসদেবের নিজের কল্পিত ঘটনার বিবরণ। একথা সত্যি নাকি?

উত্তর : আপনি নিজেই বলেছেন দুর্মতি লোকেরা বলে। আসলে শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার ও রাজাদের যে কথা রয়েছে তা শ্রীল ব্যাসদেবের কল্পিত কিছু নয়। ঐসব ঘটনা ব্যাসদেবের আগে থেকেই কাহিনী ও কিংবদন্তী রূপে প্রচলিত ছিল। ব্যাসদেব ঐ সমস্ত কিছু গভীর মননের দ্বারা সুসংবদ্ধ করে মানুষের কল্যাণের জন্য এই অমূল্য রত্ন ভাগবত জগৎকে দিয়ে গেছেন। এই অমূল্য রত্ন লাভ করে জগতের মানুষ তার মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পেয়েছে।

প্রশ্ন : ৯১১ ॥ কেন ভগবৎ ভক্তরা কোন ধরনের মুক্তিই চান না?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ ভাগবতেই রয়েছে—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈ কত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা।

(শ্রীমদ্ ভাগবত ৩/২৯/১৩)

অর্থাৎ ভগবানের সাথে সমলোকে বাস, সকল ঐশ্বর্য, সমীপে অবস্থান, সমান রূপ এবং ভগবানের সাথে একত্ব—অর্থাৎ সাযুজ্য প্রদত্ত হলেও যাঁরা প্রকৃত ভক্ত, তাঁরা সেসব গ্রহণ করেন না। তাঁরা কেবল

ভগবানের সেবা করতেই চান। এই অপূর্ব ভক্তিতত্ত্বই ভাগবতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯১২ ॥ ভাগবতের মূল বা প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের মূল বা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভগবৎ উপাসনার রস-স্বরূপতা। উপনিষদে বলা হয়েছে **"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"**—অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানই রস-স্বরূপ। রস-স্বরূপ তাঁকে লাভ করে জীবও আনন্দময় হয়ে যায়। ভাগবতে এই আনন্দময় ভগবানের কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯১৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অদ্বৈতবাদীদের ধারণা কিরূপ। উদাহরণ দিন।

উত্তর : কেবলা অদ্বৈতবাদীদের গুরু হলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। তিনি মূলত মায়াবাদ প্রচার করেন বৌদ্ধধর্মের নাস্তিক্যবাদ ঠেকানোর জন্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, একমাত্র গোবিন্দকে ভজনা না করলে মুক্তির কোন উপায় নাই। শঙ্করাচার্যের পর শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকে সবচেয়ে বড় অদ্বৈতবাদী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তাঁর গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

বংশী বিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ বিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখান্দরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

—অর্থাৎ যাঁর গায়ের রং নতুন মেঘের মতো নীল, যাঁর হাতে বাঁশী শোভা পাচ্ছে, যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেছেন, যাঁর অধর পাকা বিম্ব (চালতা) ফলের মতো রক্তিমাভ, যাঁর মুখ পূর্ণ চন্দ্রের মতো সুন্দর, যাঁর চোখ পদ্মের মতো মনোহর, সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছু আছে বলে আমি জানি না।

প্রশ্ন : ৯১৪ ॥ ভাগবত কি ধরনের শাস্ত্র?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত হলেন ভগবানের লীলা-বর্ণন তথা গুণ-বর্ণনাময় শাস্ত্র। ভাগবতেই বলা হয়েছে যে ভাগবত শ্রবণে পরম পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ হয়, যাঁর দ্বারা মানুষ শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি অতিক্রম করতে পারে। কাজেই বুঝা যায় ভাগবত হলেন মূলত ভক্তিশাস্ত্র। এর প্রমাণ ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই রয়েছে, **সত্যং পরং ধীমহি**—অর্থাৎ আমরা সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। আবার ভাগবতের শেষ দ্বাদশ স্কন্দে বলা হয়েছে, **তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোক-মমলং সত্যং পরং ধীমহি**। শ্রীধর স্বামীপাদ পরং শব্দের অর্থ করেছেন, পরমেশ্বর শ্রী নারায়ণ নামক তত্ত্ব। কাজেই বুঝা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাগবতে শ্রী ভগবানের কথাই রয়েছে।

প্রশ্ন : ৯১৫ ॥ অনেকে বলেন ভাগবতের প্রথম শ্লোক এবং গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। একথা কি ঠিক?

উত্তর : ভাগবতের প্রথম শ্লোক গায়ত্রী মন্ত্রের মতই পবিত্র এবং অর্থবহ। **গায়ত্রী মন্ত্রে তৎসবিতু বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি**—অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারিতা, রচয়িতার শক্তির ধ্যান করি—বলা হয়েছে। ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও বলা হয়েছে, যা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ জ্ঞান সঞ্চার করেন, তাঁর ধ্যান করি। কাজেই দেখা যায় গায়ত্রী মন্ত্র এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় একই।

প্রশ্ন : ৯১৬ ॥ জগতে তো বহু ধর্মশাস্ত্র রয়েছে যাতে ধর্মের স্বরূপ, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আছে। তাই নতুন করে ভাগবত রচনার দরকার কি ছিল?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ ভাগবতেই (১/১/২) রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ফলের আশা করে যে ধর্মের আচরণ করা হয়, তা হল কপট ধর্ম। ভাগবতে কপট ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিহার, ফলের আকাঙ্খা বঞ্চিত, সর্বজীবে দয়াশীল সাধুদের অনুষ্ঠেয় ভগবৎ আরাধনারূপ পরম ধর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ত্রিতাপ—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখের অবসানকারী পরম মঙ্গলকারী পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এখন বরং বলা যায় এই পরম রমনীয় ভাগবত শাস্ত্র থাকতে অন্য শাস্ত্রের

প্রয়োজন কি? কেননা ভাগবত শ্রবণে ইচ্ছুক ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রবণমাত্রই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করতে সমর্থ হন।

প্রশ্ন : ৯১৭ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ—এর প্রমাণ কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত যে অপরাপর শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ শ্রীল ব্যাসদেব ভাগবতেই (১/১/২) দিয়েছেন।

১. প্রথমতঃ স্বয়ং নারায়ণ নিজমুখে ব্রহ্মাকে এই ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন।

২. দ্বিতীয়তঃ প্রায় সকল শাস্ত্রের সাধনই সকাম মাৎসর্য-যুক্ত এবং ভূতদ্রোহী ব্যক্তিদের দ্বারা সাধন হয়ে থাকে। যেমন বিশেষ কামনা-বাসনা নিয়েই বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অপরাপর ধর্মশাস্ত্রের লক্ষ্য হল ভোগ্য বস্তু লাভ—পুত্র লাভ, ধনলাভ, যশোলাভ এবং পরলোকে স্বর্গবাস। কিন্তু ভাগবতে কামনা-বাসনার কোন সম্পর্ক নাই। ভাগবত পাঠে এবং শ্রবণে মানুষ কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ভগবানে অনুরাগ লাভে সমর্থ হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনাই যে পরম মঙ্গলপ্রদ তা অনুভব করতে সক্ষম হয়।

৩. তৃতীয়তঃ ভাগবতে দেখানো হয়েছে একমাত্র গোবিন্দের চরণসেবা করলেই তাঁর কৃপায় জীবের ত্রিতাপ জ্বালা দুর হয় এবং সে পরমানন্দ লাভ করে। বিভিন্ন লীলা কথা এবং ভক্ত চরিত আলোচনা করে ভাগবতে এসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৪. চতুর্থতঃ অপরাপর শাস্ত্রের সাধনে ভগবানকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের নাম ও লীলা বর্ণনা প্রধান ভাগবত শ্রবণ করলে তখনই ভগবান তাঁর হৃদয়ে বাঁধা পড়েন। **সদ্যো হৃদ্য বরুধ্যতে**—তখনই তাঁর হৃদয়ে ভগবান অবরুদ্ধ হন।

উপরোক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আসল কথা হল এই যে ভাগবত শ্রবণে মন থেকে জড়জাগতিক বিভিন্ন বাসনা দূর হবে, ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হবে, সংসারের জ্বালা দূর হবে এবং অচিরেই ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন—এই চতুবর্গ লাভ হবে।

প্রশ্ন : ৯১৮ ॥ পিবত ভাগবতং রসমাললায়ম—এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : এর উত্তর ভাগবতেই রয়েছে। বলা হয়েছে—

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত দ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্ মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা।

—অর্থাৎ ভগবৎ রসের ভাবনায় রসিক, হে ভক্তবৃন্দ! বেদরূপ কল্পবৃক্ষের যে পরমানন্দ-রসময় ফল, যার নাম শ্রীমদ্ ভাগবত, তা শুকমুনির মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। এই দিব্য অমৃত ফল সাধনকাল থেকে সিদ্ধি লাভ পর্যন্ত বার বার আস্বাদন কর।

বেদের নির্যাস, সার বস্তু থেকে ভাগবত তৈরী হয়েছে। কাজেই ভাগবত হল সর্ববেদময়, পরম আনন্দময় এবং পরম রসময়। শুক পাখি যেমন মধুর ফল ছাড়া আর কিছু খায় না, সেই রকম পরমহংস চূড়ামনি, আজন্ম সংসার ত্যাগী শুকদেবও পরম মধুর ভগবৎ-রস ছাড়া অন্য কোন রস আস্বাদন করেন না। কাজেই শুকদেবের মুখ থেকে নির্গত এই রসময় ফল পরম মধুর। তাই বলা হয়েছে, **পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্**—হে ভক্তবৃন্দ সবসময়ই এই ভগবৎ-রস পান কর।

প্রশ্ন : ৯১৯ ॥ ব্রহ্মে নিষ্ঠ, বেদ অধ্যয়নরত এবং ১৭টি পুরাণ রচনা করা সত্ত্বেও কেন শ্রীল ব্যাসদেব মনে-প্রাণে শান্তি পান নাই?

উত্তর : এর উত্তর শ্রীমদ ভাগবতেই রয়েছে—

"ভবতানুদিত প্রায়ং যশো ভগবতোহমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥

অর্থাৎ নারদ মুণি বললেন—হে ব্যাসদেব, তুমি তোমার কোন গ্রন্থেই, বলতে গেলে শ্রীভগবানের বিমল যশোকীর্তন কর নাই। শ্রীগোবিন্দ গুণকীর্তন-শুন্য শুষ্ক জ্ঞানে ভগবানের তৃপ্তি হয় না। কাজেই তোমার সেই জ্ঞান অপূর্ণ রয়ে গেছে।

নারদ ব্যাসদেবকে বললেন, তুমি বেদ বিভাগ করেছো। ব্রহ্ম বিচার করেছো—ঠিকই। কিন্তু যাঁর নিঃশ্বাস থেকে বেদের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মেরও

যিনি আশ্রয় সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের গুণবর্ণনা করেছ কি? অনেক শাস্ত্র রচনা করেছো। তাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—সবই আছে। নেই কেবল শ্রীগোবিন্দের গুণ-লীলা-কীর্তন। মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ইত্যাদিতে শ্রীগোবিন্দের গুণ-বর্ণনা থাকলেও তা আংশিক, পূর্ণ নয়। ধর্ম প্রসঙ্গে কিংবা অন্য প্রসঙ্গে গোবিন্দের বিষয় কিছুটা বলেছ মাত্র। কিন্তু গোবিন্দ কীর্তনই যে পরম পুরুষার্থ—এভাবেতো বর্ণনা করনি। তুমি বেদজ্ঞ। কিন্তু বেদবিদ্য পরম পুরুষের কথা এককভাবে কোন গ্রন্থে বল নাই। তাই তুমি অপূর্ণ। এই তোমার মহাত্রুটী। আর এই জন্যই তুমি মনে শান্তি পাচ্ছ না।

প্রশ্ন : ৯২০ ॥ সূত গোস্বামীতো জাতিতে শূদ্র ছিলেন। তা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি নৈমিষারণ্যে বহুজ্ঞানী-গুণী মুনিঋষিদের সভায় ভাগবত পাঠের সুযোগ পেলেন?

উত্তর : প্রাচীনকালে পুরাণ বক্তা সূতেরা ছিলেন জাতিতে শুদ্র। তাঁরা বেদ পাঠ করেন নাই। কিন্তু তাঁরা ছিলেন যথার্থ ধর্মপরায়ণ এবং শ্রুতিধর—একবার শুনলেই সব মনে রাখতে পারতেন। ইতিহাস এবং পুরাণে তাঁরা ছিলেন মহাপণ্ডিত। পুরাণ বক্তা সূতেরা বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে পুরাণের কথা বলতেন। তখনকার দিনে সমাজে জ্ঞানের আদর হতো। তাই দেখা যায় মুনি-ঋষিদের যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হতেন এবং মুনি-ঋষিরা সাদরে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে তাঁদের পুজা করে তাঁদের কাছ থেকে পুরাণ কথা শুনতেন। সেখানে জাতি বিচারের কোন স্থান ছিল না। কাজেই শ্রীল শুকদেবের মুখ থেকে ভাগবত কথা শুনে মনের আনন্দে যখন নৈমিষারন্যের কাছ দিয়ে শ্রীল সূত গোস্বামী যাচ্ছিলেন তখন সেখানকার মুনি-ঋষিরা শৌণিক মুনির নেতৃত্বে তাঁকে ভাগবত পাঠের অনুরোধ করেন। তাঁদের সেই অনুরোধে সেখানে শ্রীল সূত গোস্বামী ভাগবত পাঠ করেন।

প্রশ্ন : ৯২১ ॥ শ্রীল ব্যাসদেব রোমহর্ষণ নামের একজন সূতকে বিভিন্ন পুরাণ শিখিয়েছিলেন। তারপরও তিনি রোমহর্ষণকে বাদ দিয়ে নিজপুত্র শুকদেবকে কেন ভাগবত শুনিয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীল শুকদেবকে ভাগবত শিখানোর বিশেষ কারণ ছিল যা অন্য কাউকে দিয়ে সফল হতো না। প্রথম কারণ এই যে তখনকার দিনে ব্রহ্মের উপাসনাই ছিল মোক্ষ বা মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। বেদের যাগ ও যজ্ঞের ক্রিয়ার ফল অস্থায়ী জেনে মুক্তিকামী ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে বেদান্ত (উপনিষদ) শ্রবণ করতেন এবং পরে মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাঁরা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতেন। এইভাবে তখনকার দিনের উচ্চ বর্ণের লোকেরা সাধন করতেন। কিন্তু তখনকার দিনে শূদ্রের বেদের পঠন এবং পাঠনের অধিকার ছিল না। রোমহর্ষণ সূত ছিলেন জাতিতে শুদ্র। তাই এই সাধনার ধারা জানতেন না এবং তার সেই অধিকারও ছিল না।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, ব্যাসদেব বুঝেছিলেন যে কালের প্রভাবে মানুষের আয়ু এবং শক্তি কমে যাবে। তখন তাদের পক্ষে নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই তিঁনি ভাগবতে প্রচার করলেন যে বাসুদেবই পরব্রহ্ম—সগুণ এবং নির্গুণ। তাঁকে ভক্তি করলেই নির্গুণ ব্রহ্মেরও জ্ঞান লাভ হবে। (ভাগবত ১/২/২৮-২৯)। কিন্তু এই মতবাদ প্রচার করতে গেলেই নানা প্রশ্ন, সংশয়, বিতর্ক এবং বিরক্তি আসবে এবং তার সমাধানের জন্য আবার ব্যাসদেবকেই সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এই ভাগবতবাদ, ভক্তিবাদ যদি আজন্ম শুদ্ধ, সদ্যমুক্তি, নির্গুণ নিরাকার-ধ্যাননিষ্ঠ এবং ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুকদেবকে দিয়ে প্রচার করানো যায় তাহলে আর কোন সংশয় থাকবে না; কারো মনেই আর কোন প্রশ্ন উঠবে না। কাজেই বুঝা যায় তখনকার দিনে ভাগবত তত্ত্ব বলা এবং ভক্তিযোগের মহিমা প্রতিপাদন করার সামর্থ একমাত্র শুকদের ছাড়া অন্য কারো ছিল না।

তৃতীয় কারণ হল সম্পূর্ণ নিষ্কাম, সর্ব-বাসনারহিত, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আধার ছাড়া ভগবানের কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেম লীলা সাধু

সমাজের কাছে কেউ বর্ণনা করতে পারতেন না। সে জন্যই ব্যাসদেব ভাগবত প্রচারের জন্য শুকদেবকেই মনোনীত করেন।

প্রশ্ন : ৯২২ ॥ শ্রীল শুকদেব তো ছিলেন আত্মারাম এবং ব্রহ্ম-মননশীল। তাঁরতো কোন শাস্ত্রপাঠ করা বা শোনানোর প্রবৃত্তি হওয়ার কথা নয়। তবুও শুকদেব কেন ভাগবত অধ্যয়ন করলেন এবং অপরকে তা শোনালেন?

উত্তর : এর উত্তর শ্রীমদ্ ভাগবতেই রয়েছে—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুনো হরি ঃ

—অর্থাৎ ভগবানের এমনই অদ্ভুত আকর্ষণ যে, নিবৃত্তি মার্গে অধিষ্ঠিত আত্মা রামেরা পর্যন্ত ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন, ভগবৎ লীলা শ্রবণে লালসাযুক্ত হয়ে পড়েন।

শ্রীল শুকদেব নির্গুণব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হলেও কৃষ্ণ-গুণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির লীলা বিষয়ক শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। শুকদেব পরে ভগবৎ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিত এবং উপস্থিত সাধু বৃন্দের কাছে এই ভাগবত কীর্তন করেন। তারপর থেকেই এই পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত জগতে প্রচারিত হওয়া আরম্ভ করে।

প্রশ্ন : ৯২৩ ॥ ভাগবত বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীর আসল নাম কি ছিল? তিঁনি কার পুত্র ছিলেন? তিঁনি জাতিতে কি ছিলেন?

উত্তর : শ্রীল সূত গোস্বামীর আসল নাম ছিল সূত উগ্রশ্রবা। তাঁর পিতার নাম ছিল সূত রোমহর্ষণ। এই রোমহর্ষণকেই শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণ শিখিয়েছিলেন। ইনিও সবসময় কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত হয়ে থাকতেন। তাই লোকে তাঁকে রোমহর্ষণ বলতো। আর সূত গোস্বামী ভগবানের কথা শোনবার জন্য সবসময় উৎকীর্ণ হয়ে থাকতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল উগ্রশ্রবা। সূত গোস্বামী জাতিগতভাবে শুদ্র ছিলেন।

প্রশ্ন : ৯২৪ ॥ ভগবানের আবির্ভাবের পেছনে নাকি দুইটি কারণ রয়েছে? সেগুলো কি কি?

উত্তর : ভগবানের আবির্ভাবের দুইটি কারণ আছে : বহিরঙ্গ কারণ এবং অন্তরঙ্গ কারণ। ভগবানের অসুর বধ, এবং ধর্ম সংস্থাপন এসব হলো তাঁর আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ।

ভগবান হলেন রস-স্বরূপ। তিনি রসআস্বাদনের জন্যও অবতীর্ণ হন। এটি হল তাঁর আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ। এই কারণ সম্পর্কে সকলে জানে না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই জানেন।

প্রশ্ন : ৯২৫ ॥ কোন ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও যদি বিবশ হয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তবে তাঁর গতি কি হবে?

উত্তর : সংসার-প্রবাহে পতিত—অর্থাৎ ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিও যদি বিবশ অবস্থায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তবে অজামিলের মতো সেও তখনই মুক্ত হয়ে যাবে। জীব বহু জন্মের কর্ম ফলে সংসারে যাতায়াত করে। কিন্তু গোবিন্দ নামের এমনই মহিমা যে অবশ অবস্থাতেও যদি তাঁর নাম একবার উচ্চারিত হয় তবে তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়। আর তা হবেই না কেন? স্বয়ং ভয়ও (যম) যাঁকে ভয় করে চলেন, (যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্)—সেই গোবিন্দ নাম যার মুখে উচ্চারিত হয় তার কি আর কোন ভয় থাকতে পারে? শ্রীল নরোওমদাস তাই বলেছেন—

শুনিয়া গোবিন্দ রব।
ভয়েতে পালাবে সব।
সিংহ রবে যেন অরিকুল।

প্রশ্ন : ৯২৬ ॥ নৈমিষারন্যে শ্রীল সূত গোস্বামীকে সমবেত মুণি-ঋষিরা প্রথমে মূলত কয়টি প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেগুলোর মর্ম কি?

উত্তর : মুণিঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীকে প্রথমে মূলত ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন যা সর্বকালে সকল লোকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। প্রশ্নগুলো হল—

১. জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল কিসে হয়?

২. সর্বশাস্ত্রের সার কি?

৩. শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
৪. তিনি কি কি লীলা করেছেন?
৫. তিনি কোন্ কোন্ অবতারে কি কি কর্ম করেছেন?
৬. শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হলে ধর্ম কার শরনাপন্ন হয়েছিলেন?

প্রশ্ন : ৯২৭ ॥ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। তার পুত্রের নাম পরীক্ষিত কেন হয়? আবার পরীক্ষিত মহারাজের আর এক নাম বিষ্ণুরাত। কেন?

উত্তর : পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম কৃষ্ণ সখা অর্জুনের পুত্রের নাম ছিল অভিমন্যু। এই অভিমন্যু মৎসদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা যান। তখন উত্তরার গর্ভে তার সন্তানকে নষ্ট করার জন্য যুদ্ধের পর অস্ত্র গুরু দ্রোনাচার্য্যের পুত্র অশ্বথামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করে দেন। ঐ সময় মাতৃগর্ভেই উত্তরার গর্ভস্থিত সন্তানের কৃষ্ণ দর্শন হয়েছিল। তাই জন্মের পর সেই নবজাত শিশু কোন লোক দেখলেই তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পরীক্ষা করতো এবং মনে মনে ভাবতো এই কি সেই, যাকে মাতৃগর্ভে দেখেছিলাম।

মানুষ দেখলেই অভিমন্যু পুত্র এই কি মাতৃগর্ভে দৃষ্ট পুরুষ—মনে মনে এই পরীক্ষা করতেন বলে তিনি পরীক্ষিত নামে বিখ্যাত হন।

আবার পরীক্ষিতের জন্মের পর ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন যে কালের প্রভাবে কুরুবংশ ধ্বংসের সম্মুখীন হলে তার রক্ষার জন্য ভগবান কৃপা করে এই বালককে দান করেছেন। ভগবানের অনুগ্রহের দান বলে এই বালকের নাম হবে বিষ্ণুরাত। (শ্রীমদ্ ভাগবত ১/১২/১৭)।

প্রশ্ন : ৯২৮ ॥ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিত সমবেত মুনি-ঋষিদের কাছে কি প্রার্থনা করেছিলেন?

উত্তর : সমবেত মুনি-ঋষিদের কাছে মহারাজ পরীক্ষিত বলেছিলেন, "আপনাদের চরণে বার বার প্রণাম করে এই প্রার্থনা জানাই যে, যেখানেই আমার পুণরায় জন্ম হোক না কেন, আমার যেন গোবিন্দে

মতি থাকে, তাঁর ভক্তদের উপর প্রীতি হয় এবং সর্বজীবে যেন আমার মিত্রভাব হয় (শ্রীমদ্ ভাগবত ১/১৯/৬)। কি সুন্দর কথা। গোবিন্দে মতি, ভক্তে প্রীতি আর সর্বজীবে মিত্রভাব।

প্রশ্ন : ৯২৯ ॥ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের সামনে যখন শ্রীল শুকদেব উপস্থিত হন তখন তাঁর শরীর কিরকম ছিল?

উত্তর : ঐ সময় শ্রীল শুকদেবের আকৃতি ছিল ষোল বছরের যুবকের মতো। হাত, পা, এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ছিল অতি সুন্দর। আকর্ন বিস্তৃত নয়ন, উন্নত নাসিকা (নাক), সুললিত কর্ণদ্বয়, মনোহর ভ্রূযুগল-শোভিত মুখমণ্ডল এবং কণ্ঠদেশ শঙ্খের মতো ত্রিরেখান্বিত (ভাগবত ১/১৯/২৬)।

শুকদেবের কণ্ঠের নিম্নভাগ ছিল স্থুল, বিশাল বক্ষ, গভীর নাভি, দিগম্বর (বস্ত্রহীন), এলোমেলো চুল, আজানুলম্বিত বাহু এবং শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট শরীর। (ভাগবত ১/১৯/২৭)।

প্রশ্ন : ৯৩০ ॥ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তৎকালীন সময়ের মানুষ উন্মত্ত (পাগল) জড় এবং মূক (বোবা) বলে ভাবতো কেন?

উত্তর : তাঁর উলঙ্গ এবং ধূলিমাখা দেহ দেখে লোকে তাঁকে পাগল মনে করতো। কিন্তু কেন বিশেষভাবে তিনি পাগল, তা বোঝা তখনকার মানুষের পক্ষে অসাধ্য ছিল। তার উপর তিনি ছিলেন মৌন—অর্থাৎ কারো সাথেই কোন কথা বলতেন না। ভাগবতেই রয়েছে যে, শুকদেব গৃহস্থদের গৃহ পবিত্র করবার জন্য গো-দোহনকাল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে অন্য স্থানে চলে যেতেন। এসব কারণে তৎকালীন সাধারণ লোকজন তাঁকে পাগল, জড় এবং মূক বলে মনে করতো।

প্রশ্ন : ৯৩১ ॥ মুমূর্ষু—অর্থাৎ যার মৃত্যু অতি আসন্ন তার কর্তব্য কি?

উত্তর : শ্রীমদ ভাগবতে একই প্রশ্ন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন (ভাগবত ২/১/৫)। হে পরীক্ষিত! যারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায় তাদের সর্বময় ভগবান শ্রী হরির কথাই শ্রবণ, কীর্তন এবং

স্মরণ করা উচিত—এইতো জীবের একান্ত কর্তব্য। এ থেকে বুঝা যায় ভাগবতের মূলকথাই হলো—ভগবানের স্মরণ, মনন, কীর্তন করতে হবে—এই হল সকলের সার কথা।

বৈরাগ্যের অভ্যাস, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন, সাংখ্য যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি অনুশীলন করেও জীব কৃতার্থ হতে পারে না, যদি না মৃত্যুর সময় নারায়ণ স্মৃতি ভগবানের কথা মনে আসে।

প্রশ্ন : ৯৩২ ॥ শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ কেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (২/১/১১) শ্রীল শুকদেব মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেন, হে মহারাজ! ভক্ত, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগী সকলেই ভগবানের নাম কীর্তনকেই একমাত্র দুঃখহারী, সর্বত ভয়-হারক বলে স্থির করেছেন।

ভগবানের নাম কীর্তনকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অকুতোভয় বলেছেন। অর্থাৎ নাম কীর্তনে কোন পতনের আশংকা নাই। যাগযজ্ঞ, জ্ঞানের সাধন ইত্যাদিতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা থাকে। সেজন্য শুদ্ধ ভক্তেরা সবকিছু ত্যাগ করে সর্বফলদাতা গোবিন্দের নাম কীর্তন করে থাকেন। আসন্ন-মৃত্যু জীবের কর্তব্য সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব প্রথমে শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ—এই তিন রকম সাধনের কথা বলেছেন (ভাগবত ২/১/৫)। তারপর তিনি অত্যন্ত সহজ, মহাশক্তিশালী এবং কলিজীবের একমাত্র কর্তব্য নাম সংকীর্তনের প্রাধান্য দেখিয়েছেন।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ এবং লীলার স্মৃতি জীবের অশেষ পাপ দূর করে ঠিকই। কিন্তু এসব অনেক আয়াস-সাধ্য। কিন্তু নাম কীর্তন কেবলমাত্র ঠোঁটের স্পন্দনেই সাধিত হয়। কাজেই নাম সংকীর্তনই সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর **শিক্ষাষ্টকমে** বলেছেন : নান্মাকারি **বহুধা নিজ সর্ব শক্তি স্তত্রাপির্তা নিয়মিত স্মরণে এ কাল ঃ**

ভগবানের অনেক নাম—অনন্ত নাম এবং প্রত্যেক নামের মধ্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। তাছাড়া এই নাম করবার জন্য কোন সময়েরও নিয়ম নেই—যখন ইচ্ছা তখনই ভগবানের নাম কীর্তন করা যায়।

প্রশ্ন : ৯৩৩ ॥ পাণ্ডবদের মাতা কুন্তিদেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করার সময় বলেছেন—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

এখানে তিনি ভগবানের নামের কোন্ ভাবের অভিব্যক্তির কথা বলেছেন?

উত্তর : এখানে কুন্তীদেবী ভগবানের পাঁচটি অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

১. কৃষ্ণ : সকলের হৃদয়কে যিনি সর্বদা আকর্ষণ করেন তিনিই সর্বাকর্ষক।

২. বাসুদেব : ভগবান নিজেই বসুদেবের বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পুত্র বাসুদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

৩. দেবকীনন্দন : ভগবান দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করেছেন।

৪. নন্দ গোপকুমার : নন্দের পুত্ররূপে তিনি ব্রজবাসীদের ভগবৎ লীলায় রস-ভরপুর করেছেন বলে তিনি নন্দকুমার।

৫. গোবিন্দ : গোপলীলায় সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে তিনি গোবিন্দ হয়েছেন।

প্রশ্ন : ৯৩৪ ॥ পাণ্ডবদের পিতামহ ভীষ্মদেব ভগবানের কোন মূর্তির উপাসক ছিলেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত (১/৯/২৪) থেকে দেখা যায় ভীষ্ম শরশর্য্যায় থেকে তাঁর অন্তিম সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সশরীরে দেখে এই প্রার্থনা করেছিলেন : আমার চিরজীবনের ধ্যান এবং ধ্যেয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে, শঙ্খ, চক্র-গদা-পদ্মধারী মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বদনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমার দেহত্যাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। জীবনের এই শেষ সময়ে যেন এই ইস্ট দর্শনে বঞ্চিত না হই। শ্লোকের **ধ্যানপথ শ্চতুর্ভুজঃ** থেকে মনে হয় ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তির উপাসক ছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৩৫ ॥ কৃষ্ণের একরূপ পরব্রহ্ম, অন্যরূপ পরমাত্মা এবং অপর রূপ লীলাময়। তাহলেতো কৃষ্ণ একজন নয়। তাই নয় কি?

উত্তর : একই সূর্যকে নানা জায়গার লোক নানাভাবে দেখে। সূর্যকে কেউ গাছের উপর, কেউ মাথার উপর নির্দেশ করে। কিন্তু এতে সূর্য অনেক হয়ে যায় না। সেই রকম কৃষ্ণকে কেউ অন্তর্যামি বা পরমাত্মা রূপে, কেউ পরমব্রহ্মরূপে, কেউ লীলাময় রূপে দেখে থাকেন। কিন্তু ভগবান তাতে বহু হন না, তিনি একই থাকেন। তিনি অর্ন্তযামী, তিনি পরব্রহ্ম, আবার তিনিই লীলাময়। কেবলমাত্র বিভিন্ন সাধকের ভাব এবং সাধনার জন্য পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : ৯৩৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে তিনি অজ—অর্থাৎ যার কোন জন্ম নেই। তাহলে আমরা কেন তার জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কথা বলি?

উত্তর : একথা ঠিক যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ। তাঁর কোন প্রাকৃত জন্ম নেই। তবে প্রাকৃত জন্ম না হলেও তিনি ভক্তের জন্য জন্ম লীলা—অর্থাৎ ভক্তের জন্য জন্মগ্রহণ করার মতো আবির্ভূত হন। এককথায় জাও ইব—যেন জন্মগ্রহণ করেছেন—এরূপ লীলা প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন : ৯৩৭ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব পূর্ব জন্মে কে ছিলেন?

উত্তর : সাম্ব পূর্বজন্মে কার্তিকের রূপে দেবী অম্বিকার পুত্র ছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৩৮ ॥ দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি অনেক অন্যায় ও অত্যাচার করেছে। অথচ ভগবান কৃষ্ণ এসব দেখেও তার কোন প্রতিকার করেন নাই। আবার তাঁরই ভক্ত পাণ্ডবেরা বিনা অপরাধে বনে বনে কষ্ট করে বেড়িয়েছেন। ভগবানের এরূপ ব্যবহারের কারণ বা তাৎপর্য কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/১/৪৩) বলা হয়েছে, অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার শাস্তিবিধানে ভগবান সমর্থ হলেও যে সব দুষ্ট রাজারা বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং বংশ গৌরবের অভিমানে মত্ত হয়ে অসংখ্য সৈন্যের

দ্বারা বার বার পৃথিবীকে উৎপীড়ন করে তাদের তিনি বধ করেন। এইভাবে বিপন্নদের দুঃখ দুর করার জন্যই ভগবান দুর্যোধন প্রমুখের নানা অত্যাচার প্রথম দিকে উপেক্ষা করেছিলেন।

একজন অন্যায় করলে তাকে কেবলমাত্র শাস্তি দিলে কি হবে। তার পেছনে যে আরোও অনেকে রয়েছে—যাদের সাহায্য ও কুপরামর্শ এবং সহযোগীতায় সে ঐরূপ অন্যায় কাজ করতে পেরেছে। কাজেই অন্যায়ের সাহায্যকারীদেরকেও শাস্তির বিধান করতে হবে—নইলে অন্যায়ের মূল থেকে যাবে। তার জন্য উপযুক্ত সময় এবং পরিবেশের অপেক্ষা করতে হয়। ততদিন পর্যন্ত নিরপরাধ ব্যক্তিরা অত্যাচারিত হতে থাকে। উপযুক্ত সময়েই ভগবান দুষ্টের বিনাশ করেন। তাই দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান তার ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দুর্যোধনসহ তার মিত্রদেরকে সমূলে বিনাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৩৯ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা নিহত হন তাদের মধ্যে কি কেউ শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/২/৯০) বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেসব বীরেরা, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম চোখ দিয়ে পান করতে করতে অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন তারাও ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে করতে যারা মৃত্যুর সময় মনে মনে ভগবানের শরনাগত হয়েছিলেন তারাই ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৪০ ॥ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা উদ্ধব পূর্ব জীবনে কি ছিলেন?

উত্তর : পূর্ব জন্মে উদ্ধব অষ্টবসুর একজন ছিলেন। তৎকালীন সময়ে প্রজাপতিগণ এবং বসুগণ মিলে এক যজ্ঞ করেন। সেখানে বসুদেবরূপী উদ্ধব শ্রীহরিকে পাওয়ার জন্য আরাধনা করেন। এই সুকৃতির ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বাপরে উদ্ধবকে পরম ভক্ত করে তাঁকে সহচর রূপে নিজের কাছে রেখে দেন।

প্রশ্ন : ৯৪১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্তলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তাঁর সখা উদ্ধবকে রেখে গেলেন কেন? তাকে সঙ্গে নিলেন না কেন?

উত্তর : শ্রীভগবান ভাগবতে (৩/৪/৩০) বলেছেন যে "আমি এই মর্তধাম থেকে অন্তর্হিত হলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমাতে আশ্রিত জ্ঞান যথার্থভাবে ধারণ করতে সমর্থ। অর্থাৎ একমাত্র উদ্ধব ছাড়া আমার বিষয়ক, ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানের ধারক এবং বাহক আর কেউ হতে পারে না।"

যেহেতু (ভাগবত ৩/৪/৩২) ত্রিগুণের বশীভূত নয়, তাই ভগবানের মতো সে মায়াকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিল। কাজেই উদ্ধবই ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দেয়ার জন্য এই পৃথিবীতে অবস্থান করুক—এই ছিল ভগবানের ইচ্ছা।

মূলত ভগবৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের উপদেশ পৃথিবীতে চলতে থাক, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বদরিকা আশ্রমে গিয়ে অবস্থান করতে বলেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৪২ ॥ সৃষ্টির পূর্বে কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : সৃষ্টির পূর্বে—এই কথাটি দ্বারা বুঝতে হয় যে এক কল্প (ব্রহ্মার এক দিন = জড়জগতের ৪৩২ কোটি বছর) শেষ হয়েছে এবং পরবর্তীকল্প তখনও আরম্ভ হয় নাই—এই মধ্যবর্তী সময়কে সৃষ্টির পূর্বে বলা হয়। এই অবস্থায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জিনিস, এমনকি সৃষ্টির যে মূলকারণ সেই অব্যক্ত মায়াশক্তি পর্যন্ত তখন একমাত্র ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে। ঐ অবস্থায় শ্রীভগবানের অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম-স্বরূপ অবস্থা ছাড়া আর কিছুই থাকে না—অর্থাৎ তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ অবস্থায় থাকেন। এই পরমাত্ম স্বরূপ অবস্থাকেই বেদান্তে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯৪৩ ॥ ভগবৎ জ্ঞান লাভ কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/৫/৪২) বলা হয়েছে : শ্রদ্ধা এবং সাধন-রূপ ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। শ্রদ্ধা হলো গুরু বাক্য এবং শাস্ত্রে

বিশ্বাস। গুরুর মুখ থেকে উপদেশ শুনে সেই অনুযায়ী সাধন-রূপ ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করলে বৈরাগ্য জন্মে এবং সেই বৈরাগ্য থেকে ভগবৎ জ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্ন : ৯৪৪ ॥ কারা সহজেই ভগবৎ ধাম বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/৫/৪৬) রয়েছে ভগবানের কথামৃত শ্রবণ, তাঁর লীলামৃত আস্বাদন, একান্তিক ভক্তির মাধ্যমে চিত্ত নির্মল করতে পারলে বৈরাগ্য-জনক জ্ঞান লাভ হয় এবং এসবের মাধ্যমে অনায়াসে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠে পৌছা সম্ভব।

প্রশ্ন : ৯৪৫ ॥ জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের সাধনার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : স্থূল অর্থে জ্ঞান এবং ভক্তি পথের সাধকের মূল উদ্দেশ্য একই—দুঃখের নিবৃত্তি। জ্ঞানমার্গের সাধক নিত্য এবং অনিত্য বস্তু বিচার এবং কঠোর মনঃসংযম করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেন। ভক্তি পথের সাধক সবসময় ভগবানের নাম কীর্তন, লীলা শ্রবণ এবং ভগবানের পাদপদ্মের ধ্যান করে পরম পুরুষার্থ, পরম আনন্দ লাভ করেন।

জ্ঞান এবং ভক্তি—দুই ধরনের সাধনাতেই মনঃসংযম এবং তন্ময়তা অভ্যাস করতে হয়। জ্ঞানী পরমাত্মায় একেবারে লীন বা মিশে যান। নিজের কোন সত্ত্বাই তার আর থাকে না। ভক্তও ভগবানে একেবারে তন্ময় হয়ে যান। কিন্তু ভগবৎ রস আস্বাদনের জন্য যতটুকু নিজের সত্ত্বা রাখা দরকার কেবলমাত্র ততটুকুই রাখেন। ভক্তের ভাব—চিনি খেতে ভালবাসি। কিন্তু চিনি হতে চাই না। অধিকারী ভেদে জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা স্থির হয়। সাধারনত বলা হয় যে জ্ঞানের পথ কঠিন এবং ভক্তির পথ সহজ।

প্রশ্ন : ৯৪৬ ॥ ভক্তিভাবে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় কি?

উত্তর : সদ্ গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করে সাধন করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবানের ধ্যান করলে সংসারের যাবতীয় বিষয়ের উপর

বিরাগ এবং পরমাত্মায় অনুরাগ হয়। এই বৈরাগ্য থেকে জ্ঞান এবং মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু প্রকৃত ভক্তেরা মুক্তি চান না। তারা শ্রীভগবানের চরণ সেবা করতে চান। এই যে জ্ঞানের সাধন বলা হলো এটি অদ্বৈত বাদীদের মত নয়—ভাগবতের মত।

প্রশ্ন : ৯৪৭ ॥ শ্রুতি (উপনিষদ) বলছেন ব্রহ্ম হলেন নিষ্ক্রিয়। তাই এইরূপ ব্রহ্ম দ্বারা গুণের প্রকাশ এবং সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত (৩/৭২) থেকে দেখা যায় একই ধরনের প্রশ্ন বিদুর মৈত্রেয় মুণিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

শ্রীভগবান নিজের যোগমায়া শক্তিকে অবলম্বন করে লীলার জন্য জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করে থাকেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে অদ্বৈতবাদীদের বেদান্ত অনুযায়ী ভগবান নির্গুণ আর সব ধরনের গুণরহিত এবং নিষ্ক্রিয় অর্থে সব ধরনের কাজকর্ম রহিত বুঝায়। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীভগবানকে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় বলতে একটু অন্যরকম বোঝায়। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত এবং বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক বৃন্দাবন হলেন শ্রীভগবানের নিত্যধাম। কাজেই বিগ্রহ থাকলেই তাতে গুণ এবং ক্রিয়া থাকবে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, চিৎ শব্দের অর্থ স্বরূপ-শক্তি। কাজেই চিৎ শব্দে বুঝতে হবে যে স্বরূপ শক্তিতে অবস্থান হল ভগবানের নিত্যভাব। বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে তিঁনি নিজের ঐশ্বর্য সহ নিত্য বিরাজ করেন। শ্রীভগবানে লৌকিক গুণ-সুখ, দুঃখ ইত্যাদি এবং লৌকিক ক্রিয়া নেই। তাঁর সব কাজই দিব্য।

প্রশ্ন : ৯৪৮ ॥ এক ঈশ্বরই সর্বভূতে জীবরূপে অবস্থান করছেন। তাহলে জীবের দুঃখ কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর : শ্রীভগবানের ক্রিয়া এবং জীবের দুঃখানুভূতি—এই সবই মায়ার কাজ। আর মায়ার স্বরূপই এমন যে তাকে বোঝা যায় না। যেমন একজন লোক স্বপ্নে দেখলো যে তার মাথা কাটা গিয়েছে। আসলে কিন্তু তার মাথা কাটা যায় নাই। কিন্তু স্বপ্নে এরূপ অনুভূতিই

হয়। কাজেই স্বপ্নে দেখা এই ঘটনা একটি ভুল বিশ্বাস। সেই রকম দুঃখ, বন্ধন ইত্যাদি বাস্তবিকপক্ষে জীবাত্মার থাকে না। কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবকে দুঃখী এবং বদ্ধ বলে মনে হয়। দেহাদির ধর্ম—অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ইত্যাদি জীবের পক্ষে অসত্য হলেও সেগুলো জীবের ধর্ম বলে মনে হয়। জলে প্রতিবিম্ব চন্দ্রের মতো দেহের ধর্ম জীবেই প্রতীয়মান হয়, ঈশ্বরে নয়।

প্রশ্ন : ৯৪৯ ॥ ভগবানের ইচ্ছাতেই নাকি তাঁর অনুচররা বা পার্ষদরা কখনো কখনো অসুর হয়ে জন্মায়। ভগবানের এই অদ্ভুত ইচ্ছার তাৎপর্য কি?

উত্তর : এর উত্তরে বলা যায় শ্রীভগবানের কখনো কখনো যুযুৎসা বৃত্তি—অর্থাৎ যুদ্ধ করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি কার সাথে যুদ্ধ করবেন? সকলেইতো তাঁর কাছে হীনবল। তাই অনেক সময় ভগবান ঠিক করেন যে অনুচর বা পার্ষদরা আমার মতই প্রায় বলশালী এবং প্রিয়ভক্ত। এদেরকে প্রতিপক্ষ করে আমার যুদ্ধাকাঙ্খা পুরণ করবো। আবার আমার এই ইচ্ছা পুরণে ভক্তরাও আনন্দ লাভ করবে। আমার প্রতিপক্ষ তৈরী করবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লৌকিক শিক্ষণীয় বিষয়ও থাকবে।

প্রশ্ন : ৯৫০ ॥ বলা হয় সাধুসঙ্গ নাকি ভক্তিলাভের উপায়। তাহলে সাধুর কি কি লক্ষণ আছে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৩/১৫/১১) বলা হয়েছে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকেই সাধু বলে জানতে হবে।

১. সাধু ব্যক্তিরা সব ধরনের দুঃখ কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করেন।
২. তাঁরা অত্যন্ত করুনাশীল।
৩. জগতের সবার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।
৪. তাঁরা অজাতশত্রু—অর্থাৎ কেউ তাদের শত্রু নয়।
৫. তাঁরা সন্তাপহীন চিত্তে অবস্থান করেন।
৬. নিরন্তর ভগবৎ লীলা কথায় আলাপ এবং শ্রবণে ব্যাপৃত থাকেন।

এইসব সদ্‌গুণের অধিকারী কোন ব্যক্তিই সাধু এবং তাঁদের সঙ্গ করলেই ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের উদয় হয়।

প্রশ্ন : ৯৫১ ॥ সাংখ্যমতের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের ভগবান কপিলদেব—দেবাহূতি সংবাদে এই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হল : পুরুষ এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, আপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ), পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ), অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক)।

প্রশ্ন : ৯৫২ ॥ চিত্তকে বশীভূত করার উপায় কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান কপিলদেব তার মাতা দেবাহূতিকে এই বিষয়ে (ভাগবত ৩/২৭/৬) বলেন : যম, নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) নিয়মিত অভ্যাস করলে চিত্ত একাগ্র ও বাসনা শুন্য হয়। তখন শ্রদ্ধা ও প্রেমের সাথে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করা আবশ্যক। এই করলে চিত্ত বশীভূত হতে পারে।

প্রশ্ন : ৯৫৩ ॥ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভক্তি কি?

উত্তর : যারা কর্তব্যবোধে বা ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করেন তাদের ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে। নাম, যশ, এবং ঐশ্বর্যের আশায় প্রতিমাদিতে যারা পুজা করে তাদের ভক্তিকে রাজসিক ভক্তি বলে। আর যারা হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য ইত্যাদির বশীভূত হয়ে পুজা করে তাদের ভক্তিকে তামসিক ভক্তি বলে।

প্রশ্ন : ৯৫৪ ॥ নির্গুণা ভক্তি কাকে বলে?

উত্তর : যারা পরমেশ্বর ভগবানকে ফলের আকাঙ্খা রহিত হয়ে ভজনা করে তাদের সেরূপ ভক্তিকে নির্গুণা ভক্তি বলে। এই নির্গুণা ভক্তির সাধকগণ ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কিছুই চান না। এমনকি ভগবানের সাথে একই লোকে বাস, ভগবানের সমীপে থাকা, ভগবানের সাথে একত্ব লাভ ইত্যাদি পর্যন্ত চান না। এরূপ ভক্তিভাবকেই মুক্তি লাভের চরম উপায় বলা হয়। এই ভক্তির সাধক সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

প্রশ্ন : ৯৫৫ ॥ জগতে কাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা যায়?

উত্তর : ভগবানে যার চিত্ত সমর্পিত—অর্থাৎ দেহাদির সমস্ত কর্ম, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করেছেন এবং সবধরনের কর্মের ফল ত্যাগ করেছেন—এই রকম কর্তৃত্ব-অভিমান শুন্য সমদর্শী পুরুষই জগতে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন : ৯৫৬ ॥ ধ্রুবলোক কোথায়?

উত্তর : আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে দুরে মহারাজ ধ্রুবর নামাঙ্কিত একটি নক্ষত্র আছে। তাকে ধ্রুবমণ্ডল বা ধ্রুবলোক বলে। এই স্থানকে কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ আবর্তিত হয়। সেখানে গেলে আর কখনো পতনের আশঙ্কা থাকে না।

প্রশ্ন : ৯৫৭ ॥ আত্মা এবং দেহের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : শ্রীমদ ভাগবতের ৪র্থ স্কন্দে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

১. আত্মা একই অবস্থায় থাকেন, তার কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দেহের বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্তন হয়।

২. আত্মা দোষ রহিত। কিন্তু মল-মুত্রাদির দ্বারা দেহ দুষিত হয়।

৩. আত্মা স্ব-প্রকাশ। আর দেহ হল জড়।

৪. আত্মা রূপ-রসাদি শুন্য। কিন্তু দেহ হল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন।

৫. আত্মা হল সত্ত্ব, রজ, তম ইত্যাদি গুণের আশ্রয় স্বরূপ—অর্থাৎ গুণাধীশ। আর দেহ হল এসব গুণের অধীন।

৬. আত্মা সর্বব্যাপী। আর দেহ হল ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ।

৭. আত্মা অনাবৃত। কোনকিছু দ্বারাই তাকে আবৃত করা যায় না। কিন্তু দেহকে বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি দ্বারা ঢাকা যায়।

৮. আত্মা হলেন সাক্ষী। আর দেহ হল দৃশ্য।

৯. আত্মা হলেন নিরাত্মা—অর্থাৎ অন্য কিছুতেই অধিষ্ঠিত নয়। আর দেহ আত্মাতে অধিষ্ঠিত।

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন।

প্রশ্ন : ৯৫৮ ॥ মহারাজ পৃথু ভগবানের কাছে তাকে বহু কর্ণ (কান) দেয়ার কথা প্রার্থনা করেছিলেন। কেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত (৪/১০/২৪) থেকে দেখা যায় মহারাজ পৃথু ভগবানকে বলছেন : "আমাকে অসংখ্য কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দান করুণ, যাতে প্রাণভরে আপনার গুণকথা শুনতে পারি—মাত্র দুইটি কানে আপনার গুণকথা শুনে তৃপ্তি পাচ্ছি না। কাজেই আমাকে অজস্র কান দান করুন—প্রাণভরে আপনার কথা শুনি। এইটিই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ বড় পাওনা হবে।"

শ্রীল রূপগোস্বামী তার বিদগ্ধ মাধব বইতেও (১-৩৩) একই কথা বলেছেন : "কৃষ্ণ"—এই দুটি বর্ণ যদি মুখে তাণ্ডবিনী হয়—অর্থাৎ উচ্চারিত হয়, তবে বহু বহু মুখের জন্য বাসনা হয়—অর্থাৎ বহু মুখে এই কৃষ্ণ নাম করার ইচ্ছা হয়। এই বর্ণ দুটি যদি কর্ণ ক্রোড়ে অঙ্কুরবর্তী হয়—অর্থাৎ এই নাম যদি কর্ণে প্রবেশ করে তবে দশকোটি কর্ণের ইচ্ছা হয়। আর যদি চিত্ত প্রাঙ্গনের সঙ্গিনী হয়—অর্থাৎ মনের মধ্যে কৃষ্ণ নামের স্ফুরণ হয় তবে সমস্ত ইন্দ্রিয় সমূহের পরাজয় হয়—অর্থাৎ অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ৯৫৯ ॥ শ্রীভগবানে অনুরাগ এবং বিষয়ে বিরাগ কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : এর উত্তর শ্রীমদ্ ভাগবতেই (৪/২২/২৪) রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে অহিংসা, নিবৃত্তি, আত্মকল্যাণের অনুসন্ধান, ভগবানের লীলামৃত পানে ব্যাকুলতা, কামনা-বাসনা-ত্যাগ, শৌচাদি নিয়ম পালন, অপরের নিন্দা না করা, স্পৃহা শুন্যতা এবং শীতোষ্ণাদি সহ্য করা—এসবের দ্বারা ভগবানে অনুরাগ এবং বিষয়ে বিরাগ জন্মে।

প্রশ্ন : ৯৬০ ॥ বহিরঙ্গ সাধন এবং অন্তরঙ্গ সাধন কাকে বলে?

উত্তর : অহিংসা, যম, নিয়ম, অকাম, তিতিক্ষা ইত্যাদি হল বহিরঙ্গ সাধন। আর ভগবৎ উপাসনা, তাঁর লীলা শ্রবণ ও কীর্তন ইত্যাদি হল অন্তরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ সাধন করলে অন্তরঙ্গ সাধন সহজ হয়ে যেতে

পারে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধন করলে বহিরঙ্গ সাধন—যেমন নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি আপনা-আপনিই হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ৯৬১ ॥ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার চেয়ে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কি সহজসাধ্য?

উত্তর : হ্যাঁ। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৪/২২/৩৯) বলা হয়েছে বিষয়ে নিবৃত্ত এবং সংযত ইন্দ্রিয় যুক্ত যতিগণও (সন্ন্যাসীগণ) সহজে কর্মপাশ ছেদন করতে পারেন না। অর্থাৎ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ এবং বন্দনা করে মানুষ যত সহজে অহঙ্কার মুক্ত হয় তত সহজে জ্ঞান ও যোগের সাধনায় অহঙ্কার মুক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সনৎকুমার বলেছেন—জ্ঞানপথের সাধন—অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার চেয়ে সংসার মোহে যেসব মানুষ অন্ধ তাদের পক্ষে ভক্তিযোগের সাধনা—অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সহজ সাধ্য। এককথায় আত্মজ্ঞান লাভের, মুক্তি লাভের অনেক উপায় আছে বটে—কিন্তু সবই কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। একমাত্র ভক্তিভাব অবলম্বন করে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেই ভক্তি এবং মুক্তি উভয়ই অনায়াসে লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন : ৯৬২ ॥ প্রাচীনকালে তো এখনকার মতো সমাজ গৃহ (কমিউনিটি সেন্টার) বক্তৃতা মঞ্চ, পত্র-পত্রিকা সহ যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম ছিল না। সেই সময় ধর্ম জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং এসবের প্রচার কেমন করে হতো?

উত্তর : ভারতবর্ষ তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সময় যখন কোথাও বড় ধরনের যাগযজ্ঞ, উৎসব ইত্যাদি হতো তখন সেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে জ্ঞানী, গুণী, মুনি-ঋষিরা আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। ঐসব মহতী সভায় দেশের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতো। যাঁরা এরূপ সভায় যোগ দিতেন তাঁদের মাধ্যমেই দেশের জনগণ এইসব তত্ত্ব জানতে পারতেন।

প্রশ্ন : ৯৬৩ ॥ বলা হয় ভগবানে দেহাভিমান নেই, কোনরকম ভেদ-বুদ্ধিও নেই। তাই নিন্দা, স্তুতিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হন না। তবে যে দেখা যায় তিনি অসুর বধ করছেন?

উত্তর : হ্যাঁ। কিন্তু এটি অসুরদের কল্যাণের জন্য। ভগবানের দেহ-অভিমান নেই বলে নিন্দাতে তাঁর কোন প্রকার বৈষম্য হয় না। শ্রীমদ ভাগবতে (৭/১/১৫) বলা হয়েছে : শত্রুভাবেই হোক অথবা বন্ধুভাবেই হোক, ভয়েই হোক কিংবা কামভাবেই হোক—যে কোনভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে পারলেই, আর ভগবানে কোনরকম বৈষম্য দেখা যাবে না। ভগবানের চিন্তা করে সে নিন্দার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে সাযুজ্য—অর্থাৎ ভগবানে লীন হয়ে যায়। বেশীরভাগ অসুরই এরূপ মুক্তি লাভ করে।

প্রশ্ন : ৯৬৪ ॥ বলা হয় ভগবানের সাথে শত্রুতা করে, তাঁকে হিংসা করে, অথবা কামভাবেও তাঁকে লাভ করা যায়। এটি কি কথার কথা মাত্র, না এর কোন নজীর বা উদাহরণ আছে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (৭/১/৩০) রয়েছে : যে কোনভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করতে পারলেই তাঁকে লাভ করা যায়। উপমা স্বরূপ গোপীরা কামভাবে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রমুখ রাজারা বিদ্বেষবশত, যাদবেরা আত্মীয়তাবশত এবং পাণ্ডবেরা স্নেহভাবের জন্য শ্রীভগবানকে লাভ করেছেন।

প্রশ্ন : ৯৬৫ ॥ ভগবানের দ্বারপাল জয় এবং বিজয় ঋষিদের অভিশাপে তিনবার অসুর দেহ ধারণ করেছিলেন। কোন্ যুগে এবং কিরূপে?

উত্তর : ভগবান বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন জয় এবং বিজয়। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছায়, ঋষিদের অভিশাপকে উপলক্ষ করে তিনবার অসুরদেহ ধারণ করে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমবার সত্যযুগে তাঁরা কশ্যপমুণি ও দিতির পুত্ররূপে হিরনাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে। দ্বিতীয়বার ত্রেতাযুগে রাবন ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং

দ্বাপর যুগে তৃতীয়বার শিশুকাল এবং দন্তবক্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁরা প্রতিবারই শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৬৬ ॥ দৈত্যরাজ হিরন্যকশিপুর কয় ছেলে ছিল এবং তাদের নাম কি ছিল?

উত্তর : দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারজন ছেলে ছিল। তাদের নাম ছিল হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং প্রহ্লাদ। এদের মধ্যে প্রহ্লাদই ছিলেন সর্বগুণ সম্পন্ন এবং হরিভক্ত।

প্রশ্ন : ৯৬৭ ॥ নববিধা ভক্তির কথা শুনি। এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করলেও কি জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ হতে পারে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

উত্তর : হ্যাঁ। নববিধা ভক্তির যেকোন একটি অঙ্গ সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারলেও জীবের অভিষ্ট, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

১. পরীক্ষিত মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করে,
২. শুকদেব গোস্বামী হরিকথা কীর্তন করে,
৩. প্রহ্লাদ হরিকে স্মরণ করে,
৪. লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির পাদসেবণ করে,
৫. মহারাজ পৃথু শ্রীহরির অর্চনা করে,
৬. অক্রুর শ্রীহরির বন্দনা করে,
৭. হনুমান শ্রীহরিকে দাস্যভাবে সেবা করে,
৮. অর্জুন শ্রীহরির সখ্য সেবা করে এবং
৯. মহারাজ বলি শ্রীহরিকে সর্বস্ব নিবেদন করে পরম পুরুষার্থ লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৬৮ ॥ বসুদেব কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেবকীর পুত্র জন্মানো মাত্রই তিনি তাদেরকে কংসের হাতে তুলে দেবেন। তাহলে বসুদেব তাঁর অষ্টম পুত্রটিকে (অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণকে) কংসের হাতে না দিয়ে গোপনে নন্দালয়ে রেখে আসলেন

কেন? তাহলেতো সত্যবাদী হয়েও বসুদেব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। তাই নয় কি?

উত্তর : সাধারণ কথায় আপনার প্রশ্ন ঠিক। কিন্তু ভাগবতের টীকাকারগণ বসুদেবের কথার মধ্যে দুই ধরনের অর্থের সন্ধান করেছেন। তারা বলেন বসুদেব বলেছিলেন **যতস্তে ভয়মুত্থিতম্** (ভাগবত ১০/১/৫৪)। অর্থাৎ যে পুত্রদের কাছ থেকে তোমার ভয় আছে, তাদেরকে তোমার হাতে দেব। এখন **যতস্তে** এবং **ভয়মুত্থিতম্**—এই দুইটি শব্দের মধ্যে যদি একটি লুপ্ত অ থাকে, তবে উচ্চারণে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে। **যতস্তেহ ভয়মুত্থিতম্**—অর্থাৎ যাদের থেকে তোমার অভয়, কোন ভয়ের আশাঙ্কা নেই এমন পুত্রদেরকেই আমি তোমার হাতে সমর্পণ করবো। প্রকারান্তরে বলা হল, যে পুত্রটি থেকে তোমার ভয় আছে তাকে আমি তোমার হাতে দেব না। কংস সহজ অর্থই গ্রহণ করেছিল, দ্বিতীয় অর্থটা সে বুঝতেই পারেনি। কাজেই বসুদেবকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলা যায় না।

প্রশ্ন : ৯৬৯ ॥ কংস পূর্ব জীবনে কি ছিল?

উত্তর : কংস পূর্বজীবনে অসুর হিরন্যাক্ষের পুত্র কালনেমি নামক এক অসুর ছিল। সেই সময় সে বিষ্ণুরূপী শ্রী নৃসিংহদেবের হাতে নিহত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৯৭০ ॥ বলরামকে দেবকী এবং রোহিনীর সন্তান বলা হয়। একই ব্যক্তি দুই জনের সন্তান কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : বলরাম অনন্তরূপে দেবকীর সপ্তম সন্তানরূপে তার গর্ভে আবির্ভূত হন। কিন্তু ঐ সময় দেবকীর দুঃখ হলো যে আগের ছয়টি সন্তানের মতো একেও কংস বধ করবে। দেবকীর মনের এই দুঃখ এবং ভয়ের কথা জেনে ভগবান তাঁর যোগমায়া শক্তিকে আদেশ করলেন—হে দেবী! দেবকীর গর্ভে আমারই অংশ সম্ভূত সংকর্ষণ নামে যে পুত্রটি রয়েছে, তাকে তুমি আকর্ষণ করে রোহিনীর গর্ভে স্থাপন কর। যোগমায়া তখন দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিনীর গর্ভে স্থাপন করলেন। লোকে

জানলো যে দেবকীর এই গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বসুদেবের অপর পত্নী রোহিনী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছে।

প্রশ্ন : ৯৭১ ॥ যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা জগৎকে কৃষ্ণময় দেখে। আবার কংসও শত্রুতা করে জগৎময় কৃষ্ণকে দেখেছিল। তাহলে কৃষ্ণ ভক্ত এবং কৃষ্ণ বিদ্বেষীর মধ্যে তফাত কোথায় রইল?

উত্তর : তফাত এই যে কৃষ্ণভক্ত প্রেমে জগৎকে কৃষ্ণময় দেখে পরমানন্দে পূর্ণ হয়। আর কৃষ্ণবিদ্বেষী শত্রুভাবে সর্বত্র কৃষ্ণময় দেখে ভয়ে, রাগে এবং হিংসায় জ্বলতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকে। এজন্যই দেখা যায় শত্রুভাবের জন্য ভয়ে কংস শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে—সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করে সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দেখতে আরম্ভ করেছিল।

প্রশ্ন : ৯৭২ ॥ শাস্ত্রেইতো ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীদের কর্তব্য নির্ধারিত আছে। লোকে সেই সেই কর্তব্য পালন করলেইতো জ্ঞান এবং মুক্তি লাভ করতে পারবে। তবে ভগবানের আর অবতারের দরকার কি?

উত্তর : ঈশ্বর বা ভগবান সর্বভূতে আছেন একথা সত্য। কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্খা মিটে না। যেমন গরুর যেখানটাই আমরা ছুই না কেন গরুকেই ছোঁয়া হবে। কিন্তু গরুর গা থেকেই দুধ হয়। দুধ পেতে হলে গরুর বাট ছুঁতে হবে। সেরকম ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে কিন্তু তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হলে, তাঁকে ভালবাসতে হলে অবতারের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন : ৯৭৩ ॥ শ্রীভগবান কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর সামনে কিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর : ভগবান পরম সুন্দর মূর্তিতে আবির্ভূত হন। তার রূপের কিছুটা বর্ণনা শ্রীল শুকদেব ভাগবতে (১০/৩/৯-১০) বর্ণনা করেছেন : সেই শিশু পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভূজ (চার হাত বিশিষ্ট) শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলায় কৌস্তুভমণি শোভ পাচ্ছে।

পীতাম্বর পরিহিত তাঁর শরীরের বর্ণ হলো নবজলধর শ্যাম। তাঁর মহামূল্য বৈদুর্য মণি সংযুক্ত কিরীট (মুকুট) কুণ্ডলের জ্যোতিতে কুন্তল রাশি (মাথার চুল) উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯৭৪ ॥ ভাগবত থেকে দেখা যায় কংসের কারাগারে ভগবান বসুদেব এবং দেবকীর সামনে পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার পর দেবকী একবার ভগবানকে তুমি আবার অন্যসময় আপনি বলে সম্বোধন করছেন। এরূপ তিনি কেন করেছিলেন?

উত্তর : ভগবানকে সামনে আবির্ভূত হতে দেখে বসুদেব এবং দেবকীর মধ্যে একদিকে ঐশ্বর্য্য এবং অন্যদিকে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়েছিল। ঐশ্বর্যভাবে তিনি ভগবানকে আপনি বলে এবং বাৎসল্যভাবের সময় তুমি রূপে সম্বোধন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৭৫ ॥ আমরা জানি কৃষ্ণ দেবকী এবং বসুদেবেরই পুত্র এবং বসুদেব তাকে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন। তারপরও ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী নন্দত্মাজ উৎপন্নে কথা বলেছেন। তাহলে কি নন্দগৃহে ভগবান নন্দ—যশোদার পুত্র রূপেও জন্ম নিয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/৫/১) বলা হয়েছে—মহামনা নন্দের পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তিনি পরম আনন্দে স্নান ও বহু অলংকার ধারণ করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে তাদের দিয়ে পুত্রের জাতকর্মাদি করালেন। এই শ্লোক থেকে মনে হয় নন্দালয়ে কৃষ্ণের জন্মের মধ্যে একটু বিশেষ রহস্য আছে যা শুকদেব স্পষ্টভাবে না বলে ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। একথা থেকে মনে হয় যেন শুকদেব ইঙ্গিতে বলছেন—শ্রীভগবান নন্দেরও পুত্র।

শ্রীভগবান নন্দেরও পুত্র—একথা শুনলে সবাই বলবেন এ কি করে সম্ভব? এ যে ঘটনা বিরোধী কথা। কারণ কৃষ্ণ মথুরা থেকে ব্রজে এলেন। তিনি কেমন করে আবার নন্দের পুত্র হতে পারেন? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণব তোষনী টীকায় এর অতি সুন্দর এবং

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বাইরের দৃষ্টিতে নন্দপুত্র অসম্ভব হলেও তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ নন্দেরও পুত্র বটেই। কারণ শ্লোকে রয়েছে আত্মজ। আত্মজ শব্দের অর্থ আত্মা থেকে জাত। আর ভগবান যখন কারও আত্মজ হন তখন বুঝতে হবে যে সাধারণ জীবের মতো পিতামাতার দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয় নাই। তাঁর জন্ম অপ্রাকৃত।

প্রশ্ন : ৯৭৬ ॥ ভগবানতো সবার হৃদয়েই অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত—তিনি সবার হৃদয়েই রয়েছেন। তবে কি তিনি সবারই আত্মজ?

উত্তর : না, তা নয়। যাঁরা বাৎসল্য প্রেমময় ভক্ত, তাঁরা যখন ভগবানকে পুত্ররূপে লালন-পালন করবার জন্য ব্যাকুল হন তখনই তিনি তাদের হৃদয়ে পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তখন পুত্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ে চিন্তা করে করে আর সাধ মিটে না। প্রত্যক্ষভাবে লালন-পালন করার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠেন। তখনই তাঁদের হৃদয়স্থ প্রেম মূর্তি বাইরে প্রকাশিত হন। বাৎসল্য প্রেমময় ভক্তের হৃদয়ের মূর্তির বাইরে প্রকটিত হওয়াকেই ভগবানের জন্ম হওয়া বলে।

প্রশ্ন : ৯৭৭ ॥ ভগবানের পিতামাতা হিসাবে বসুদেব-দেবকী এবং নন্দ-যশোদার মধ্যে পার্থক্য কি ছিল?

উত্তর : বসুদেব এবং দেবকীর ভগবানে ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্যভাব ছিল। অপর দিকে নন্দ ও যশোদার ছিল শুদ্ধ বাৎসল্যভাব। তাঁরা ভগবানকে প্রাকৃত শিশু রূপেই লালন-পালন করতেই সুখ অনুভব করেছেন। বাৎসল্য প্রেমময় ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়াকেই ভগবানের আত্মজ হওয়া বলে। লোকচক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হওয়াকেই ভগবানের জন্ম হওয়া বলে।

কৃষ্ণের জন্ম গ্রহণ এবং আত্মজ হওয়া উভয় পক্ষেই সমান। তফাত শুধু এইটুকু যে বসুদেব এবং দেবকীর ঐশ্বর্য-মিশ্রিত বাৎসল্যভাবের জন্য ভগবান তাঁদের সামনে চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে পরে আবার প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করেছিলেন। অপরদিকে নন্দ-

যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যভাব। তাই ভগবান মাধুর্যময় দ্বিভুজ শিশুরূপেই তাঁদের ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা বসুদেব-দেবকীর মতো ভগবানের স্তব করেন নাই, বরং পুত্র বলে যশোদা তাঁর স্তন্য পান করিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৭৮ ॥ কৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র ছয় দিন তখন কংসের চর পুতনা রাক্ষসী তাঁকে মারবার জন্য নন্দালয়ে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ তাকে দেখেই চোখ বুজলেন। কেন?

উত্তর : এর উত্তর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থে বলেছেন।

১. শিশুর স্বভাবই এই যে তারা কিছুক্ষণ জেগে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তাছাড়া শিশুরা অপরিচিত লোক দেখলেই চোখ বন্ধ করে দেয়।

২. চোখ বোজার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলেছেন যে ভগবান অন্তর্যামী। সকলের মনের ভাব জানতে পারেন। পুতনা এসেছে ব্রজের শিশুদের বধ করতে একথা কৃষ্ণের অজানা নয়। তাই পুতনার মুখ দর্শন করতে চান না বলেও তিঁনি চোখ বন্ধ করেছিলেন।

৩. তৃতীয় কারণ হল পুতনা মায়ার দ্বারা নিজের আসল রূপ ঢেঁকে সুন্দরী গোপনারী বেশে নন্দালয়ে এসেছে। ভগবান হলেন জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর কাছে মায়া অবস্থান করতে পারে না। কৃষ্ণ ভাবলেন—আমি যদি পুতনার দিকে তাকাই তাহলে তার মায়ার বেশ দূর হয়ে রাক্ষসী রূপ বেরিয়ে পড়বে। এতে আমার স্নেহশীলা মায়েরা আমার অমঙ্গল আশঙ্কায় মুচ্ছিত হয়ে পড়বেন। তাই তিনি চোখ বুজে ছিলেন।

৪. চতুর্থ কারণ হিসাবে বলেছেন যে ভগবান জানেন বধ করার কাজ নিষ্ঠুরতা। ভগবানও পুতনার মঙ্গলের জন্য তাকে বধ করতে হবে ভেবে লজ্জায় এবং দুঃখে তার দিকে না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৭৯ ॥ দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেছেন এমন কোন ভক্ত কি নন্দালয়ে ছিল? থাকলে তাদের নাম বলুন।

উত্তর : দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেছেন এমন কিছু ভক্ত নন্দালয়েও ছিলেন। এদের মধ্যে দুই জন ছিলেন প্রধান। তাদের নাম ছিল রক্তক এবং পত্রক।

প্রশ্ন : ৯৮০ ॥ ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ভঙ্গ করেন—এর প্রমাণ কি?

উত্তর : এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমন কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধরবেন না। আবার তাঁর ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি কৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করিয়ে ছাড়বেন। শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাই ভগবান রক্ষা করেন, নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

আবার যশোদা মাতা কৃষ্ণকেই বন্ধন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কৃষ্ণও কিছুতেই বন্ধন স্বীকার করবেন না। শেষ পর্যন্ত ভক্ত মায়ের কথাই তিনি রক্ষা করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৮১ ॥ কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়ে যশোদা বহু দড়ি ব্যবহার করেও দেখেন প্রতিবারই দুই আঙ্গুল দড়ি কম পড়ছে। কেন এমন হয়েছিল?

উত্তর : ভগবানতো যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে চির আবদ্ধ আছেনই। তবু কৃষ্ণের দেহকে বাঁধতে হলে দুইটি জিনিসের দরকার ছিল। প্রথমত তাঁকে বাঁধার জন্য পূর্ণ ব্যগ্রতা এবং দ্বিতীয়ত তাঁর কৃপা। ভক্তের ব্যগ্রতা ও ভগবানের কৃপা একত্র না হলে শত চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁধা যায় না। যশোদার বেলায় প্রথমে এই দুইটি জিনিসের অভাব ছিল। তাই প্রতিবারই দুই আঙ্গুল পরিমাণ দড়ি কম পড়েছিল।

প্রশ্ন : ৯৮২ ॥ গোপজাতীয় লোকদের ছাড়া কি কৃষ্ণ ব্রজধামের অন্য কোন নীচু জাতীয় লোকদের কৃপা করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। ব্রজধামে গোপেরা ছাড়াও কিছু নিচুজাতীয় লোকও বসবাস করতো। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/১১/১০-

১১) এইরকম একজন নিচ বংশজাত স্ত্রীলোকের মাধুর্যভাব বর্ণনা করেছেন।

একদিন এক ফলওয়ালী নন্দ ভবনের পাশের রাস্তায় "ফল কিনবে গো"—এই রকম কথা বলায় কৃষ্ণ ফল পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি এক মুঠো ধান নিয়ে ফলওয়ালীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তিঁনি ফলওয়ালীকে বললেন, আমি তোমার ফল নেব। মুঠো করে তাড়াতাড়ি ধান নিয়ে যাবার সময় কৃষ্ণের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ধানগুলো পড়ে যায়। ফলওয়ালী পরম স্নেহবশত কৃষ্ণের শুন্য হাত ফলে ভরে দিল। হঠাৎ ফলওয়ালী দেখলো যে তার ফলের ঝুড়ি নানাবিধ রত্নে পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানেই কৃষ্ণের কৃপা এবং ফলওয়ালীর সেবা সার্থকতা।

প্রশ্ন : ৯৮৩ ॥ কালীয় নাগের বিষের জ্বালায় কালীয় হ্রদের আশেপাশের সব গাছপালা মরে গিয়েছিল। অথচ কৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমনের জন্য হ্রদের তীরের একটি কদম গাছ থেকে লাফ দিয়ে জলে পড়েছিলেন। এ কি করে সম্ভব?

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তার **গোপাল চম্পু** বইতে এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন গরুড় যখন স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে নাগলোকে যাচ্ছিলেন তখন এই কদম গাছে সে একটু বিশ্রাম করেছিল। সেই সময়কার অমৃত স্পর্শে গাছটি তখনও বেচে ছিল।

শ্রীধর স্বামীপাদ এই কদম গাছ সম্পর্কে তাঁর ভাগবতের টীকায় বলেছেন যে, ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ এই কদম গাছে আরোহন করে কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দেবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য হবে বলেই কালীয় নাগের বিষও ঐ কদম গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে নাই।

প্রশ্ন : ৯৮৪ ॥ কালীয় নাগের প্রকৃত বাসস্থান কোথায় ছিল? সে কেন গোকূলের এক হ্রদে এসে আশ্রয় নিয়েছিল?

উত্তর : সাপেরা সমুদ্রের মধ্যস্থিত রমনক নামক এক দ্বীপে বসবাস করতো। সেখানে গরুড় মাঝে মাঝে গিয়েই সর্প ধরে খেত। গরুড়ের এই আচরণের বিরোধীতা করে কালীয় নাগ। তখন গরুড় এই কালীয় নাগকে তাড়া করলে সে পালিয়ে এসে গোকুলের একটি হ্রদে এসে

আশ্রয় নেয়। কারণ এই হ্রদে সৌভরী নামে একজন মুণি তপস্যা করতেন। গরুড় মাঝে মাঝে এখানে এসে মাছ ধরে খেতেন। তখন মাছদের রক্ষার জন্য সৌভরী মুণি এই অভিশাপ দেন যে গরুড় পুণরায় এই হ্রদে আসলে তার প্রাণ যাবে। কালীয় নাগ কোনক্রমে এই অভিশাপ শুনতে পেরেছিল। এজন্য গরুড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই হ্রদে এসে আশ্রয় নেয়। কালক্রমে কালীয়ের নাম অনুসারে এই হ্রদ কালীয় হ্রদ নামে পরিচিত হয়।

প্রশ্ন : ৯৮৫ ॥ রাসনৃত্য কাকে বলে?

উত্তর : গান-বাজনার সাথে যদি অসংখ্য নর্তকী একজন নটের সাথে মণ্ডলাকারে নৃত্য করেন তবেই তাকে রাসনৃত্য বলা হয়। এই রাসনৃত্য ছিল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলা। স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত রাসনৃত্য করতে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন : ৯৮৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে মদনমোহন কেন বলা হয়?

উত্তর : ব্রহ্মা এবং বিভিন্ন মুণি-ঋষিদেরকে তার কামবানে বিপর্যস্ত করে কামদেবের মনে এত গর্ব হয়েছিল যে, সে নিজেকে ত্রিলোক বিজয়ী বলে ভাবতে থাকে। এই মদনের ত্রিলোক-বিজয়ী গর্ব চূর্ণ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অসংখ্য গোপী পরিবৃত হয়ে এবং নিরালায় একজন মাত্র গোপীর সেবা করে যে অপ্রাকৃত লীলা করেছিলেন তাতে মদনদেবের পূর্ণ পরাজয় হয়। যে মদন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সেই মদনকে মোহিত করেছিলেন। তাই তাঁর এক নাম হয় মদন-মোহন।

প্রশ্ন : ৯৮৭ ॥ রাসলীলাকে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করি তখন তার মধ্যে শৃঙ্গার রসের কথা দেখতে পাই। এই অনুভব কি ঠিক?

উত্তর : না। কারণ রাসলীলায় জড়-জাগতিক ভাবের লেসমাত্রও নেই। রাসলীলা হল অপ্রাকৃত। মুক্তিদায়িনী। ভক্তি এবং মুক্তি রসই এই লীলার একমাত্র রস। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে আজন্ম সংসার বিরাগী পরমহংস শিরোমণি শুকদেব এই লীলার কথা বলছেন মহারাজ

পরীক্ষিৎকে যাঁর কয়েকদিন পরই মৃত্যু হবে। আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মুণি-ঋষিরা। ভোগের খরিদ্দার সেখানে কেউ ছিলেন না। কাজেই ঐ অবস্থায় জড়-জাগতিক ভোগবিলাসের কথা কেই বা বলবে আর কেই বা তা শুনবে। শুকদেব গোস্বামী রাসলীলা বর্ণনা করার পর শেষ কথা বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা যে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবে অথবা শুনবে সে হৃদয় রোগজনিত কাম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করবে। এই পাওয়া কি কখনো জড়-জাগতিক ভোগ-বিলাসের আলোচনায় লাভ করা সম্ভব?

প্রশ্ন : ৯৮৮ ॥ রাসলীলার মাধ্যমে শ্রী ভগবানের কামবিজয় লীলার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : একটি উদ্দেশ্য হল—কামদেব বা মদনদেবের গর্ব চূর্ণ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—এই বিশ্বের প্রায় সবাই কোন না কোন কাম্য বস্তুর ভোগের জন্য লালায়িত। কাজেই সর্বতোভাবে নিষ্কাম অতি দুর্লভ। যারা ভোগের কামনা ত্যাগ করেছেন তারা অষ্টসিদ্ধির কামনা অথবা মুক্তির কামনা করে থাকেন। তাই কামের হাত থেকে প্রায় কারোরই নিস্তার নেই। কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে নিষ্কাম হতে চায় তার উপায় কি? সে কার শরণাগত হবে? দেবতাদের শরণ নিয়ে লাভ নেই। কারণ তারা নিজেরাই কামের বশীভূত। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় গোপীদের সাথে বিহার করে দেখালেন যে অজেয় কামকে জয় করতে হলে রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন : ৯৮৯ ॥ রাসলীলায় এমন কি ছিল যাতে একে ভগবানের সাধারণ লীলা বলা যাবে না?

উত্তর : রাসলীলার প্রথম শ্লোকের (ভাগবত ১০/২৯/১) প্রথম শব্দই হলো ভগবান। ভগবান কে? ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি মহাশক্তি যাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় আছে তিনিই ভগবান। রাসলীলার প্রথমেই ভগবান শব্দ ব্যবহার করে শ্রীল শুকদেব তাই ইঙ্গিত করেছেন যে এটি সাধারণ কোন লীলা নয়। এই হল ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় লীলা। কারণ এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত ঐশী শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য এবং সমস্ত মাধুর্য দিয়ে এই লীলা করেছেন।

প্রশ্ন : ৯৯০ ॥ ভগবানতো ষড় ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর আবার রাসনৃত্যের কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর : ভগবান হলেন আনন্দ স্বরূপ। ভক্তেরা ভগবানকে পেয়ে আনন্দ লাভ করেন। আর ভগবান নিজেকে বিতরণ করে আনন্দ পান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমময়ী গোপীদেরকে তার স্বরূপানন্দের আস্বাদন করাতে ইচ্ছা করেন। গোপীরাতো বহুদিন ধরেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিহার করতে ইচ্ছা করেছিলেন। গোপীদের কাত্যায়নী ব্রত, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অতুলনীয় অনুরাগ দেখে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে কোন এক পূর্ণিমা রাতে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আর এর ফলেই ভগবান তার ভক্তদেরকে আনন্দ দান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাসলীলা করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৯১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে রাস লীলা করেন। এটি কি কেবল গোপীদের মনোবাসনা পুরণের জন্য, না তাঁরও আকাঙ্খা ছিল?

উত্তর : যদি রাস লীলায় ভগবানের নিজের কোন ইচ্ছা না থাকতো কেবলমাত্র গোপীদের মনোবাসনা পুরণের জন্য করতেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ইচ্ছা অভিনয়ের মতো হয়ে যেত। ভাগবতের শ্লোক (১০/২৯/১) থেকে দেখা যায় শ্রীল শুকদেব **বক্তুং মনশ্চক্রে** শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ ভগবান বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।

প্রশ্ন : ৯৯২ ॥ ভগবান যোগমায়াকে আশ্রয় করে রাসলীলা করতে ইচ্ছা করলেন—এই কথা বলার সার্থকতা কোথায়?

উত্তর : এর উত্তরে বলা যায় ভগবান যদি তাঁর ষড়ঐশ্বর্য শক্তির প্রকাশ করে রাসলীলা করতেন তবে এই লীলার এত মাধুর্য হতো না এবং তিনি নিজেও আত্মহারা হয়ে এই লীলা করতে পারতেন না। গোপী প্রেমে আত্মহারা বয়ে গোপীদের যখন যা ইচ্ছা হয়েছে ভগবান তাই করেছেন। যোগমায়া শক্তি সেই সমস্ত ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সমস্ত ব্রজ মণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ গোপীরাই

সেই আহ্বান শুনে কৃষ্ণের কাছে ছুটে আসেন। সমস্ত অঘটন-ঘটানোর জন্য যদি কৃষ্ণকেই মনোনিবেশ করতে হতো অথবা তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে হতো তবে তিনি আত্মহারা হয়ে গোপীদের প্রেম আস্বাদন করতে পারতেন না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করে তাঁর উপর সমস্ত অঘটন ঘটানোর দায়িত্ব দিয়ে নিজে রাসলীলার মাধুর্য আস্বাদন করেছেন।

প্রশ্ন : ৯৯৩ ॥ রাসলীলার তাৎপর্য কি?

উত্তর : রাসলীলায় দেখা যায় ভগবানকে পূর্ণভাবে ভালবাসলে তিনি সেই ভালবাসা গ্রহণ করেন এবং নিজেও ভক্তকে ভালবাসেন। কাজেই কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীদের হৃদয়ের সুরের সাথে যদি কোন সাধক তার হৃদয়ের সুর মিলাতে পারেন তাহলে তিনিও রাসলীলাকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন : ৯৯৪ ॥ গোপীরা কৃষ্ণের বাঁশি শুনেছিল। আমরা শুনতে পাই না কেন?

উত্তর : ভগবানতো সব সময়ই আমাদেরকে ডাকছেন। কিন্তু আমরা তাঁর আহ্বান শুনতে পাই না। তার কারণ, শোনবার মতো আমরা তৈরী হইনি। মন যে পরিষ্কার এবং সচল নয়। লোহাতে কাদা মাখানো থাকলে সেই লোহাকে চুম্বক টানে না। কাদা ধুয়ে দিলেই চুম্বক টানে। জীবাত্মার সাথে ভগবানের সম্পর্কও সেইরকম। দেহাভিমান ত্যাগ করে পূর্ণ শুদ্ধ হতে পারলেই ভগবানের আকর্ষণ বুঝা যাবে—তাঁর বাঁশী শোনা যাবে।

প্রশ্ন : ৯৯৫ ॥ যেসব গোপী নিজ নিজ পতি, পিতা-মাতা প্রমুখের বাধার জন্য রাসনৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই তারা কারা ছিলেন। তারা তখন কি করেছিলেন?

উত্তর : সাধনসিদ্ধ গোপীদের মধ্যে যারা বয়স্ক ছিলেন তাদের সাথে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সখীভাব ছিল না। ফলে ভগবানের উপর তাদের নিত্যসিদ্ধা গোপীদের মতো নির্মল প্রেম জন্মে নাই। এরাই রাসস্থলে যেতে পারেন নাই। না যেতে পারায় এঁরা গৃহমধ্য থেকেই

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একেবারে তন্ময় হয়ে যান। গভীর ধ্যানের মধ্যে কৃষ্ণের বিরহজনিত দারুণ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও হৃদয়মধ্যে ধ্যানেতেই তারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গণ করে পরম সুখ আস্বাদন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৯৬ ॥ গোপীরা কত ধরনের ছিলেন?

উত্তর : গোপীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী ছিল : নিত্য সিদ্ধা এবং সাধন সিদ্ধা। যাঁরা অনাদিকাল থেকে নিত্যই শ্রীভগবানের সাথে মিলিত রয়েছেন, সাধনের মাধ্যমে গোপীদেহ পান নাই তাঁরা নিত্য সিদ্ধা নামে পরিচিত। যেমন শ্রীমতি ললিতা, বিশাখা, প্রমুখ।

আবার ত্রেতাযুগে যখন শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন তখন সেখানে কিছু গোপাল উপাসক ঋষি ছিলেন। তাঁরা সীতা দেবীর মতো তাঁদের ইস্টদেবের সেবা করতে বাসনা করেছিলেন। এঁরাই পরে ব্রজধামে গোপীদেহে জন্ম লাভ করেছিলেন। তাই এঁরা হলেন সাধন সিদ্ধা গোপী। আবার এই সাধন সিদ্ধাদের মধ্যে দুইটি ভাগ ছিল। একদল ছিলেন নিত্যাসিদ্ধাদের সমান বয়স্কা এবং তাঁদের সাথে সখীভাবে আবদ্ধ। এঁরা নিত্য-সিদ্ধাদের সংস্পর্শে এসে ভগবানের উপর নির্মল ভালোবাসা লাভ করেছিলেন। এজন্য নিত্য সিদ্ধাদের মতো এঁদেরও পতি এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর মমতা ছিল না। এঁরাই নিত্যসিদ্ধাদের মতো স্বামী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাধা উপেক্ষা করে রাসলীলার জন্য কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। আর যারা বয়স্কা ছিলেন তাঁদের নিত্যসিদ্ধাদের সাথে সখীত্ব ভাব না হওয়ার ভগবানের উপর নির্মল প্রেম জন্মায় নাই। সেজন্য স্বামী, এবং আত্মীয়-স্বজনের উপর তাদের কিছুটা মমতা ছিল। এরাই রাসস্থলে না যেতে পেরে গৃহে থেকে কৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৯৯৭ ॥ গোপীদেরকে মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা করতে দেখে লক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণকে ঐভাবে পাওয়ার জন্য তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। তাতে কি তিঁনি কোন ফল লাভ করেছিলেন?

উত্তর : লক্ষ্মীর তপস্যার কারণ শুনে শ্রীভগবান কৃষ্ণ বললেন যে, ঐশ্বর্যের সাথে কোনরকম সম্পর্ক থাকলে গোপীভাবে ভগবৎ সেবা করা

সম্ভব নয়। গোপীরা ধনজন সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তারপর আমাকে পেয়েছেন। কিন্তু তুমি হলে নিখিল সম্পদের অধিকারিণী। তাই গোপীভাব তোমার জন্য নয়। কিন্তু তোমার এই তপস্যা বিফলে যাবে না। তুমি সুবর্ণ রেখারূপে আমার বক্ষে অবস্থান করবে। সেই অবধি লক্ষ্মী সুবর্ণ রেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ স্থল অধিকার করে আছেন।

প্রশ্ন : ৯৯৮ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীল শুকদেব রাসলীলায় অংশরত কতজন গোপীর বর্ণনা দিয়েছেন এবং তারা কারা কারা?

উত্তর : শ্রীল শুকদেব সংক্ষেপে সাতজন গোপীর পরিচয় দিয়েছেন। এরা হলেন—

১. চন্দ্রাবলী, ২. শ্যামলা, ৩. শৈব্যা, ৪. পদ্মা, ৫. শ্রীরাধিকা, ৬. ললিতা এবং ৭. বিশাখা। (এঁদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হলে আমার লিখিত শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব বইটী পড়ুন)।

প্রশ্ন : ৯৯৯ ॥ রাসলীলায় অংশগ্রহণরত গোপীদেরকে প্রেমের তারতম্য অনুসারে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : প্রেমময়ী গোপীদের মধ্যে প্রেমের তারতম্য ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা প্রেমের দুইটি বিভাগ করেছেন : তদীয়তাময় এবং মদীয়তাময়। আমি ভগবানের তাই আমি তাঁর অধীন—এইরকম যে ধারণা তাকে তদীয়তাময় প্রেম বলে। ভগবান আমার। কাজেই তিনি আমার অধীন—এইরকম যে ধারণা তাকে মদীয়তাময় প্রেম বলে। যেমন চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে দেখে আনন্দে যুক্ত করে তাঁর হাত ধরলেন। বিনিময় ও নম্রতার ভাব দেখিয়ে তিনি তদীয়তাময় প্রেমের পরিচয় দেন। শ্যামলা নামের গোপী কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহু নিজের কাঁধে স্থাপন করেন। এঁর মধ্যে তদীয়তাময় এবং মদীয়তাময়—এই দুইভাবের সংমিশ্রণ হয়েছে। অপর একজন গোপী প্রণয়কোপে অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট দংশন করে তীব্র কটাক্ষে যেন কৃষ্ণকে তাড়না করতে লাগলেন। ইনি সর্ব গোপী—শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা। এঁর পূর্ণ মদীয়তাময় ভাব ছিল। এঁর বিশ্বাস কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের নই। কাজেই কৃষ্ণের কাছে আমার যাবার দরকার নেই, কৃষ্ণ আমার কাছে

আসুক। তাই চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের কাছে দেখে অভিমানে তীব্র কটাক্ষ করেন।

প্রশ্ন : ১০০০ ॥ জড়জগতে সব কিছুর সঙ্গে ভয় তাড়িত হয়ে আছে। এমনকি কেউ আছেন যিনি সম্পূর্ণ ভয়শুন্য?

উত্তর : বৈরাগ্য শতিকম্ (৩১) গ্রন্থে বলা হয়েছে ভোগীব্যক্তির রোগ থেকে ভয়, এই বুঝি অসুখ হলো; কুলাভিমানীর কুল নষ্টের ভয়, ধনী ব্যক্তির রাজার থেকে ভয়, এই বুঝি রাজা তার ধনরত্ন কেড়ে নিল; মানী ব্যক্তির অপমানের ভয়; বলশালীর কাম-ক্রোধাদির ভয় এবং সুন্দরী স্ত্রীলোকের বার্ধক্য অবস্থায় ভয়। শাস্ত্রাভিমানীর অপর পণ্ডিত থেকে ভয়; গুণী ব্যক্তির নিন্দুকের থেকে ভয়; আর শরীরের ভয় হল মৃত্যু থেকে। কাজেই দেখা যায় জগতের সবাই কোন না কোন ভয়ে ভীত। একমাত্র বৈরাগ্যবান পুরুষই অভয় পদবাচ্য—অর্থাৎ তার কোন কিছু থেকেই ভয়ের কারণ নেই। কারণ তার কিছু হারাবার ভয় নেই।

প্রশ্ন : ১০০১ ॥ বৈরাগ্য কাকে বলে?

উত্তর : বৈরাগ্য হল বিষয়ের প্রতি বিরাগ এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগ। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হলেই মানুষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে যথার্থ হতে পারে। আর এই অনুরাগ আসে ভগবৎ উপাসনার মাধ্যমে। কাজেই দেখা যায় ভগবানের উপাসনার মাধ্যমেই মনুষ্য জীবনের চরম অবস্থা লাভ করা যায়। তাই মুণি-ঋষিরা প্রথমে শ্রী ভগবানের চরণ-উপাসনার কথাই বলেছেন। এটিই হল শ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম।

প্রশ্ন : ১০০২ ॥ মানুষের অতি মঙ্গল কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে দেখা যায় মহারাজ নিমি তার কোন এক যজ্ঞে উপস্থিত নয় জন মুণির কাছে একই প্রশ্ন করছিলেন। তখন ঐ নয় জনের মধ্যে কবি নামক এক মুণি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন (ভাগবত ১১/২/৩৩) "এই সংসারে ভগবান অচ্যুতের পাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা অকুতোভয় এবং নির্ভীক হওয়া যায়। দেহকেই যারা আত্মা বলে মনে করে এমন চঞ্চলমতি লোকের পক্ষেও ভগবৎ উপাসনাই সর্বভয় নিরসনকারী বলে আমি মনে করি।" এইভাবেই মানুষের অতি মঙ্গল হতে পারে।

প্রশ্ন : ১০০৩ ॥ ভাবগত ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর : সংক্ষেপে বলা যায় ভগবান বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যেসব উপায় বলেছেন সে সবকেই ভাগবত ধর্ম বলে। মানুষ স্বভাবের বশে শরীর দ্বারা যা করবে, বাক্য দ্বারা যা কিছু বলবে, মন দিয়ে যা কিছু চিন্তা করবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু কাজ করবে, বুদ্ধির সাথে যা কিছু নিশ্চয় করবে—সেই সবই ভগবানে সমর্পণ করবে। ভগবানে সব কিছুর সমর্পণকেই ভাগবত ধর্ম বলা যায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> **যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।**
> **যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদার্পণম্ ॥**
> (গীতা ৯/২৭)।

অর্থাৎ যা কিছু কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর—সব কিছুই আমাকে সমর্পণ করবে।

প্রশ্ন : ১০০৪ ॥ স্বরূপের জ্ঞান হলেই সমস্ত ভয় দূর হবে। কাজেই জ্ঞানের সাধনাই প্রয়োজন। তাহলে আর ভগবৎ ভজনের সার্থকতা কোথায়?

উত্তর : ভগবৎ বিমুখ ব্যক্তি মায়ার বশে স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত না হয়ে এই দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। ভগবানের মায়াশক্তির বলেই দেহাত্মবুদ্ধি জন্মে এবং আমি এই শরীর—এই রকম ভাবনা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি হয়। কাজেই ভক্তির দ্বারা, ভগবানের সেবার দ্বারা এই মায়া দূর হলেই মানুষ দেহাত্মবুদ্ধি রহিত হয়ে ভগবানের অভয়পদ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন : ১০০৫ ॥ ভগবানের কিরূপ সেবার দ্বারা মানুষ মায়াকে অতিক্রম করে দেহাত্মবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলে ভগবৎ ভক্তি লাভ করতে পারে?

উত্তর : এর উত্তর ভগবৎ গীতায় ভগবান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে**—অর্থাৎ আমাতে যে নিবিষ্ট চিত্ত সেই আমার দূরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম

করতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২/৩৯) বলা হয়েছে "চক্রপানি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মঙ্গলময় জন্ম বৃত্তান্ত এবং তার অলৌকিক কার্যকলাপ—যা সাধু লোকে কীর্তন করে থাকে সেই সব শ্রবণ এবং কীর্তন করলে এবং লোকে কি ভাববে—এই রকম চিন্তা না করে নিষ্কাম ভক্ত লজ্জাশুন্য হয়ে শ্রীভগবানের নাম ও লীলা কীর্তন করতে করতে জগতে বিচরণ করবে।" তাহলেই মানুষ মায়াকে অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।

প্রশ্ন : ১০০৬ ॥ ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমাভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয় তখন তার কি অবস্থা হয়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২/৪০) বলা হয়েছে প্রিয়তম হরির নাম কীর্তনে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হলে ভক্তের চিত্ত অপ্রাকৃত আনন্দে দ্রবীভূত হয়। তখন সে উন্মাদের মতো বিবশ হয়ে কখনো উচ্চস্বরে হাসে, কখনও কাঁদে, কখনো উচ্চ শব্দ করে গান করে এবং কখনো বা নৃত্য করতে থাকে। ভক্ত তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতি, বৃক্ষ, সরোবর, সমুদ্র ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসকেই ভগবানের শরীর মনে করে—অর্থাৎ ভগবান বাসুদের সর্বত্র সর্বজীবে এবং সর্ববস্তুতে বিরাজমান—এই অনুভব তার হয়। এই হল যথার্থ শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

প্রশ্ন : ১০০৭ ॥ এক জন্মে কি শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম কারোও হতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২/৪২) বলা হয়েছে, খাবার সময় যেমন প্রতি গ্রাসেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি হতে থাকে সেইরকম ভগবৎ ভজনে একই সঙ্গে ভক্তি, ভগবৎ অনুভব এবং সংসারের প্রতি বিরক্তি বাড়তে থাকে।

খাবার খেয়ে মানুষের পেট ভরে গেলে আর খাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। এমনকি আর খেতেও পারে না। ভগবৎ ভজনকারী কখনও ভজনে বিরত হয় না; বরং তার ভজন-সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং

শেষে সে কেবল ভজন নিয়েই বিভোর থাকে। এই রকম ভক্ত এক জীবনেই শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে।

তবে যারা উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত হতে পারে না তাদের জন্য একাধিক এবং এমনকি বহুজন্মও লাগতে পারে।

প্রশ্ন : ১০০৮ ॥ ভগবৎ ভক্তের লক্ষণ কি কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/২/৪৫) বলা হয়েছে, সর্বভূতে যিনি ভগবৎভাব—অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবানে অধিষ্ঠিত সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। সকলের মধ্যেই তিনি ভগবানকে দর্শন করেন এবং ভগবানের মধ্যেই সকলকে দর্শন করেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতে (৬/২৯) একই কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, যিনি সর্বভূতে নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্মাকে সর্বভূতে—অর্থাৎ সবকিছুতে দর্শন করেন তিনিই সমাহিত চিত্ত পুরুষ। এই রকম যে উত্তম ভক্ত তার আপন-পর বোধ থাকে না। সকলের প্রতিই তার সমান ভাব। তিনি ত্রিলোকের অধিপতি হলেও বিচলিত হন না এবং ভগবানের পাদপদ্ম থেকে ক্ষনকালের জন্যও তার মন বিচ্যুত হয় না।

প্রশ্ন : ১০০৯ ॥ শ্রীনারায়ণের স্বরূপ কি?

উত্তর : যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং নিজে কারণ রহিত, তিনিই নারায়ণ নামক পরমতত্ত্ব। তিনিই আবার স্বপ্ন, জাগরণ, সুসুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সৎ রূপে বিরাজমান থাকেন এবং দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ—তাঁর দ্বারাই সঞ্জীবিত থেকে স্ব স্ব কাজ করে যায়। সেই তাঁকেই পরমাত্মা-পরমতত্ত্ব নারায়ণ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১০১০ ॥ ভক্তি এবং জ্ঞানের দ্বারা নিষ্কাম হওয়া যায়। কিন্তু কর্মের দ্বারা কিভাবে নিষ্কাম লাভ হতে পারে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/৩/৪৬) নিমি মহারাজের এই রকম প্রশ্নে মুণি আবির্হোত্র বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসক্তি শুন্য হয়ে বেদোক্ত কর্ম করে এবং তার ফল ভগবানে সমর্পণ করে সে নিষ্কাম-সিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। বেদে যে ফলশ্রুতি রয়েছে—যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ

করলে স্বর্গ লাভ হয় ইত্যাদি, তা কেবল ভোগের লোভ দেখিয়ে মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করানোর জন্য। ক্রমে স্বর্গাদি ভোগে বিতস্পৃহ হয়ে মানুষ ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে করতে কর্মজনিত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে নিষ্কাম লাভ করে এবং ভগবৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভে সক্ষম হতে পারে।"

প্রশ্ন : ১০১১ ॥ যারা ভগবান শ্রীহরির ভজনা করে না তাদের গতি কি হবে?

উত্তর : যারা খল স্বভাবের তারা ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান, রূপ, বল, এবং কর্মে আবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত গর্বিত হয় এবং ভগবান শ্রীহরি এবং হরি প্রিয় ভক্তদের অবজ্ঞা ও অপমান করে থাকে। এরা নিজের দেহ এবং স্ত্রী-পুত্রের আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়। এরা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে বার বার ভ্রমণ করে কষ্ট পেতে থাকে।

প্রশ্ন : ১০১২ ॥ শ্রীভগবান কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ এবং কিরূপ আকার ধারণ করেন?

উত্তর : ভগবান শ্রীহরি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে নানাবর্ণ, বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্নভাবে পুজিত হন।

১. সত্য যুগে : এই যুগে শ্রীভগবান সাদাবর্ণ, চার হাত বিশিষ্ট মূর্তিতে অবতীর্ন হয়ে হংস, সুপর্ণ, যোগেশ্বর, পরমাত্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। তখন মানুষেরা শান্ত, নির্বিরোধী, সমদর্শী হয়ে শম, দম ইত্যাদি সাধনের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন।

২. ত্রেতাযুগে : এই যুগে শ্রীভগবান রক্তবর্ণ, এবং চার হাত, বিশিষ্ট হয়ে স্রুক, শ্রুব ইত্যাদি যজ্ঞো পাতধারী রূপে অবতীর্ণ হয়ে বিষ্ণু, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম ইত্যাদি নামে পুজিত হন। সেই সময় ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী লোকেরা বেদোক্ত বিধানে তাঁর পুজা করে থাকেন।

৩. দ্বাপর যুগে : শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিহিত, চক্রাদি আয়ুধ ধারী, শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত এবং কৌস্তুভমনি ভূষিত হয়ে অবতীর্ণ হন। তিনি তখন বেদ এবং তন্ত্রোক্ত বিধি-বিধানে পুজিত হন।

৪. কলি যুগে : এই যুগে শ্রীভগবান কৃষ্ণ এবং ইন্দ্র নীল-জ্যোতি বিশিষ্ট। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সংকীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন।

প্রশ্ন : ১০১৩ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতে নাকি ২৪ জন শিক্ষা গুরুর কথা রয়েছে? এরা কারা?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১তম স্কন্দে মহাত্মা যদুর সাথে একজন অবধূত (বিশেষ ধরনের সন্ন্যাসী) ২৪ জন শিক্ষা গুরুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই ২৪ জনের বৃত্তি বা কর্ম থেকে ঐ অবধূত যে সব বিষয় শিক্ষা লাভ করেছেন সে সমস্ত কথা বলে তাদের নাম উল্লেখ করেন। এরা হলেন—১. পৃথিবী ২. বায়ু ৩. আকাশ ৪. জল ৫. অগ্নি ৬. চন্দ্র ৭. সূর্য ৮. কপোত ৯. অজগর সাপ ১০. সমুদ্র ১১. পতঙ্গ ১২. মৌমাছি ১৩. হস্তী ১৪. মধুহরণকারী ব্যাধ ১৫. হরিণ ১৬. মাছ ১৭. পিঙ্গলা নামের বারবনিতা (বেশ্যা) ১৮. কুরুপক্ষী (সাদা চিল) ১৯. বালক ২০. কুমারীর হাতের বালা ২১. বাণ (তীর) নির্মাতা ২২. সাপ ২৩. মাকড়সা ২৪. কাঁচ পোকা।

প্রশ্ন : ১০১৪ ॥ উপনিষদে আছে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, সেখানে অবিদ্যা দূর করার জন্য কোন কথা না বলে শ্রীকৃষ্ণ কেন বললেন—ভক্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়?

উত্তর : চোখের অসুখ হলে যেমন ঔষধ প্রয়োগ করলে চোখ ভাল হয় এবং আগের মত সব জিনিস ভালভাবে দেখা যায় সেই রকম ভগবানের গুণগান শ্রবণ এবং কীর্তন করলে যেমন চিত্ত ক্রমশ শুদ্ধ হতে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণে দুজ্ঞেয় আত্মতত্ত্বও অনুভূত হতে থাকে।

আসলে জ্ঞান ও ভক্তি একেবারে আলাদা বস্তু নয়। চিত্তের ভগবৎ-স্বরূপতা লাভই হল প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীভগবানের মহিমা, যশ ও লীলাকীর্তন এবং শ্রবণ করলে সেই জ্ঞান সহজেই লাভ হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/১৪/২৭) শ্রীভগবান বলেছেন : বিষয়-চিন্তায় রত ব্যক্তির

চিত্ত যেমন বিষয়ে নিমজ্জিত হয় সেইরকম আমার স্মরণে-মননে নিযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়ে যায়। বিষয় চিন্তায় মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। আর ভগবানের চিন্তায় মানুষ সংসার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ১০১৫ ॥ শ্রীভগবানের বিভূতি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : শ্রীভগবান সর্বদেহীর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজমান। জগতের যা কিছু আছে সবই শ্রীভগবানের অংশ। এই অংশকেই ভগবানের বিভূতি বলা হয়।

তবে ভগবানের বিভূতি সর্বত্র বিরাজিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভূতির তারতম্য হয়। যেখানে সত্ত্বগুণ বেশি সেখানে তাঁর অংশের প্রকাশ বেশি হয়। কাজেই সেখানে ভগবানের বিভূতিও বেশি। যেমন একটি পাথর থেকে হিমালয় পর্বতের বিভূতি বেশি।

প্রশ্ন : ১০১৬ ॥ সংসারে থেকেও কখন মানুষ সংসারে বদ্ধ হবে না?

উত্তর : বিভিন্ন দুরদেশ থেকে আগত পথিকেরা কিছু সময়ের জন্য পান্থ-নিবাসে বা হোটেল বা অন্য গৃহে আশ্রয় নেয়। তাদের মিলন যেমন ক্ষণস্থায়ী সেইরকম স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজনের মিলনও ক্ষণস্থায়ী। স্বপ্নে দেখা মিলন যেমন স্বপ্নভেঙ্গে গেলেই মিথ্যা হয়ে যায় সেই রকম স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজনের দেহ নাশ হলেই জীবিত অবস্থায়ও সেই মিলন মিথ্যা হয়ে যায়। কাজেই আসক্তিহীন হয়ে উদাসীন ভাবে গৃহকর্ম করলে, অহংকার শুন্য হয়ে কাজ করলে সংসারে থেকেও মানুষ সংসারে বদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, **"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার"**—এই হল মূল কথা। আবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে একসময় বলেছিলেন, **"বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হয়ে"**। এই হল সংসারীর সংসারে আবদ্ধ না থাকার মূল উপায়।

প্রশ্ন : ১০১৭ ॥ সন্ন্যাসীর কর্তব্য কি? এই সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন উপদেশ আছে কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১-তম স্কন্দে উদ্ধবকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : সন্ন্যাসীরা ষড়রিপু সংযত করে বাসনা-রহিত হয়ে আত্মাতেই মহা সুখ অনুভব করবে এবং আমার ভাবে বিভোর হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবে। সন্ন্যাসী বৃথা তর্ক বিচারে লিপ্ত হবে না; অপরের দুর্ব্যবহার সহ্য করবে কিন্তু নিজে দুর্ব্যবহার করে অন্যের মনে কষ্ট দিবে না। ভাববে একই পরমাত্মা যেমন সর্বভূতে বিরাজমান সেইরকম তিনিও আমার হৃদয়ে অবস্থিত। সন্ন্যাসী প্রচুর আহার পেলেও আনন্দিত হবে না, আবার না পেলেও দুঃখিত হবে না। জীবন ধারণের জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন। আর আত্মতত্ত্ব চিন্তা বা লাভের জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজন। কাজেই সন্ন্যাসী জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষা করবে। একই কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও রয়েছে—

বৈরাগীর ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।
মাগিয়া যাচিয়া করে উদর পুরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

প্রশ্ন : ১০১৮ ॥ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনের মধ্যে কখন এবং কোন্ অবস্থায় কোন্‌টি শ্রেয়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১তম স্কন্দ থেকে দেখা যায় এই বিষয়ে শ্রীভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন (ভাগবত ১১/২০/৭) কর্মফলে নিস্পৃহ হয়ে যারা কর্মত্যাগ করে তাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ অভীষ্টপ্রদ। যাদের কর্মে বিরক্তি হয় নাই এবং কামনা-বাসনাও আছে তাদের পক্ষে কর্মযোগই শ্রেয়। আর আমার কথায় যাদের শ্রদ্ধা হয়েছে অথচ কর্মফলে অতি বিরক্ত বা অতি আসক্ত নয় তাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধি দান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্মফলে

নির্বেদ (অনাসক্তি) উপস্থিত হয় এবং আমার কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করতে হবে।

প্রশ্ন : ১০১৯ ॥ সদাচঞ্চল মনকে কেমন করে শান্ত করা সম্ভব?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। আবার শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১-তম স্কন্দে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন : মনকে যখন একাগ্র করার চেষ্টা করবে তখন যদি মন স্বভাববশত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তখন মনকে নিজের মতো এদিক-ওদিক যেতে না দিয়ে মনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মনকে নিজের বশে আনতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সবসময় তত্ত্ব বিচার—অর্থাৎ জগতের সবকিছুই বিনাশশীল—এই চিন্তা করতে থাকলে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসবে। বিষয়ে বৈরাগ্য হলেই শ্রীভগবানে অনুরাগ হবে। আর ভগবানে অনুরাগ হলে মন অবশ্যই শান্ত হবে। তবে এব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম উপায় হল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ।

প্রশ্ন : ১০২০ ॥ বর্তমানযুগে কি করে দুর্জনের অত্যাচার সহ্য করে কোনরকম প্রতিকারের চেষ্টা না করে থাকা সম্ভব?

উত্তর : যারা একান্তভাবে শ্রীভগবানের চরণকেই আশ্রয় করেছে তারা রাগ-বিদ্বেষ বিরহিত হয়ে সুখে দুঃখে, মান-অপমানে সমচিত্ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে অপমান সহ্য করে অন্যায়ের প্রতিকার না করে থাকা সাধারণ অর্থে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সৎ-অসৎ বিচারের দ্বারা মনকে স্থির রেখে অন্যায়-অবিচার সহ্য করার উপায় বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে আত্মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। জড়জগতে যা দেখা যায় সবই মিথ্যা। কাজেই সুখ-দুঃখও মিথ্যা। এ আমার নিজের লোক, এ আমার শত্রু—এই ভাবও মিথ্যা। যে অনুভব করে আত্মা সবার মধ্যেই বিদ্যমান, আত্মা নির্বিকার সে কারও কাছ থেকেই ভয় পায় না। তাই দুষ্ট লোকের কাছ থেকে অকারণে লাঞ্ছিত হলেও অবিচল থাকাই শ্রেয়।

প্রশ্ন : ১০২১ ॥ যে ব্যক্তি রমনীতে আসক্ত তার কি হয়?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে স্ত্রী-সঙ্গীরা কৃষ্ণের অভক্ত হয়। কারণ তারা মোহে আচ্ছন্ন থাকে। জড়জাগতিক ভোগে লিপ্ত থাকায় তারা আত্মচেতনা হারায়। যেমন সার্বভৌম নরপতি পুরুরবা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে বহু বছর ভোগে মত্ত হয়ে তার সাথে কাটিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (ভাগবত ১১/২৬/১২) যে ব্যক্তি রমনীতে আসক্ত তার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রপাঠ, শ্রবণ, নির্জনবাস, বাক্-সংযম—এ সবই বৃথা। তিনি আরও বলেন, "ত্বক-মাংস-রক্ত-স্নায়ু, মজ্জা এবং অস্থি দ্বারা গঠিত নারীদেহে যারা আনন্দ উপভোগ করে তাদের সাথে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজে বিচরণকারী কৃমিদের পার্থক্য কোথায়?"

প্রশ্ন : ১০২২ ॥ সাধু সঙ্গের ফলে কি হয়?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়।

সাধু ব্যক্তিরা সবসময়ই ভগবানে আবিষ্ট থাকেন। কোন কিছুতেই তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় না। তাঁরা সমদর্শী। তাদের আমার ও আমি বলে বোধ থাকে না এবং তারা অহংকার শূন্য। শীত, গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ তারা সমানভাবে সহ্য করে এবং দেহ ধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তার বেশি কিছুই গ্রহণ করে না। এরূপ সাধুরা সবসময়ই ভগবানের মহিমা, যশ, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করেন। এইসব কথা যারা শোনে তারা সকল পাপ থেকেই মুক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ১০২৩ ॥ শ্রীভগবানকে কি কি প্রতিমায় পুজার্চ্চনা করা যায়?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত (১১/২৭/১২) অনুযায়ী শিলাময়ী, কাঠ দ্বারা নির্মিত, ধাতু নির্মিত, চন্দনাদির দ্বারা অঙ্কিত, চিত্রাঙ্কিত (পট),

বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত—এই আট প্রকার প্রতিমায় ভগবানের পুজার্চ্চনা করা যায়।

প্রশ্ন : ১০২৪ ॥ বর্তমানকালে কিভাবে ভগবানের পুজার্চ্চনা করা হয়?

উত্তর : বর্তমানকালে যেভাবে পুজা করা হয় তাতে আসন শুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদি করে পুজারী নিজের আত্মভূত শ্রীমূর্তির জ্যোতিতে তার নিজের শরীর ব্যাপ্ত হয়েছে এরূপ চিন্তা করে মানসোপচারে—অর্থাৎ মনে মনে নানা উপাচার দিয়ে পুজা করেন। প্রতিমাদিতে ভগবানের আবাহন করে নানারকম উপাচারে—যেমন গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, চন্দন, অলঙ্কার ইত্যাদি জিনিস দিয়ে পুজা করার বিধি আছে। শেষে প্রার্থনা, স্তবপাঠ ইত্যাদিও করা হয়।

প্রশ্ন : ১০২৫ ॥ কলিযুগের লক্ষণ কি কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২/২/২) কলিযুগের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে : কলিকালে ধনের উপরই মানুষের জন্ম, গুণ এবং আচারের উৎকর্ষ নির্ভর করবে। বাহুবলই ধর্ম ও ন্যায় নীতির নিয়ন্ত্রক হবে। স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণেই বিবাহ হবে—এতে কূল, শীল, শিক্ষা, ব্যবহারের কোন প্রভাব থাকবে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা প্রাধান্য লাভ করবে। কেবলমাত্র পৈতা থাকলেই লোক ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। বেশি কথা বলতে পারলেই লোক পণ্ডিত বলে গণ্য হবে। দম্ভ প্রকাশেই সাধুত্বের লক্ষণ প্রমাণিত হবে। নাম-যশের জন্য ধর্মের আচরণ করা হবে।

প্রশ্ন : ১০২৬ ॥ কলিযুগ সর্বদোষের আকর হলেও এর নাকি একটি অতি মহান গুণ রয়েছে। সেটি কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২/৩/৫১) এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনেই মানুষ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করবে। আরোও বলা হয়েছে (ভাগবত ১২/৩/৫২) : সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপরে ভগবানের পরিচর্যা করে যা কিছু লাভ হয় সেই সবই কলিযুগে শ্রীভগবানের নাম কীর্তনেই লাভ হয়ে থাকে। তাই ধন্য এই কলিযুগ।

প্রশ্ন : ১০২৭ ॥ পরীক্ষিত মহারাজের কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল?

উত্তর : পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হয়ে সাতদিন শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেন। শুকদেব ভাগবত শুনিয়ে চলে যাবার পর পরীক্ষিত মনকে স্থির করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে, নিশ্চলভাবে শ্রীভগবানের ধ্যানে ডুবে যান। ঐ সময় তক্ষক নাগ এসে তাঁকে দংশন করে। তক্ষকের বিষাগ্নিতে তখন পরীক্ষিতের দেহ ভস্ম হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ১০২৮ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোকে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোকে বলা হয়েছে—

নাম সংকীর্তনং যস্য সর্ব পাপপ্রনাশনম্
প্রণমো দুঃখ-শমন স্তং নমামি হরিংপরম ॥

—অর্থাৎ যাঁর কীর্তনে সর্বপাপ দুর হয়, যাঁকে প্রণাম করলে সর্ব দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

প্রশ্ন : ১০২৯ ॥ আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলাই কি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট?

উত্তর : পারমার্থিক জীবন হলো আত্ম অনুশীলনপর। তার মূল উদ্দেশ্য হল নিরন্তরভাবে কৃষ্ণানুশীলন যা গৌড়িয় ভাষায় **কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি প্রেম।** এখন কোন লোক যদি তার সাধনজীবনে অনুশীলন বা অনুশাসনের মধ্যে ভগবৎ অনুভুতি লাভ না

করে—অর্থাৎ এককথায় তার আচার, ব্যবহার ও আচরণে পরমার্থ অনুশীলন না হয় এবং শুধুমাত্র শুষ্কভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে তবে এইরকম উপায় ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয় বলা যায়।

প্রশ্ন : ১০৩০ ॥ ভগবান গৌরহরি যখন সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে বাস করছিলেন তখন অনেক ব্রাহ্মণ তাঁকে ভিক্ষা দেয়ার (ভোজন করাবার জন্য) নিমন্ত্রণ করলে তিনি বলেছিলেন, আমি লক্ষপতির হাতেই মাত্র অন্নগ্রহণ করি। এখানে লক্ষপতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : জগতের জীবকে শিক্ষা দেয়ার জন্য মহাপ্রভু এই কথা বলেছিলেন। এই কথার তাৎপর্য হল তিনি ব্রাহ্মণদের জানালেন যে অপরাধ বিহীন সশ্রদ্ধ হয়ে যাঁরা প্রতিদিন লক্ষবার হরিনাম জপ করেন তাদের গৃহেই তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : ১০৩১ ॥ শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামীকে নাকি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নাই?

উত্তর : আজও অনেকের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত আছে যে শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দেয়া হয় নাই। এর পেছনে কারণ খুজতে গিয়ে আবার দুই ধরনের মতবাদ গড়ে উঠেছে। এক পক্ষের ধারণা শ্রীমন্ মহা প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও রূপ-সনাতনকে তাঁদের ম্লেচ্ছ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাঁদেরকে বর্ণ ও আশ্রমী হিন্দুদের থেকে সবসময় দুরে রেখেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিশ্বাস হল—শ্রীহরিদাস ঠাকুর হলেন অহিন্দু এবং যবন। আর রূপ-সনাতন মুসলমান বাদশাহের চাকরি নেয়ায় সমাজচ্যুত। হিন্দুর মধ্যে আর গণ্য নয়। তাই চিরন্তন প্রথা অনুসারে (যা আজ পর্যন্ত প্রচলিত) তাঁদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না।

একথা সত্য যে শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং শ্রী রূপ-সনাতন কোনদিন জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকে দেখা যায়—

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন
জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিনজন ॥
(চৈ. চ. মধ্য ১/৬৩)।

আসল কথা হল বৈষ্ণবাচার্য হয়েও স্বাভাবিক দৈন্যতাবশত তাঁরা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমনে অনিচ্ছুক ছিলেন। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অ-মানিনা মান দেন—এই নীতিতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবকের মর্যাদায় অনুরোধে বলেছেন, তাঁর স্পর্শ হইলে মোর অপরাধ। কাজেই বৈষ্ণবের দৈন্যতা এবং অ-মানিনা মান দেন—এই নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁরা ইচ্ছা করেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই।

প্রশ্ন : ১০৩২ ॥ আমরা অনেক সময় দেখি বৈষ্ণবরাও অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এর তাৎপর্য কি?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

বৈষ্ণবের যত দেখ ব্যবহার-দুঃখ।
সেহ জানিও সব পরানন্দ সুখ।

বৈষ্ণবের যে দুঃখ কষ্ট আমরা জড় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি বা দেখি উহা কোন প্রকারেই কর্ম-বদ্ধ জীবের ন্যায় কর্মফল ভোগ নয়। কারণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত কর্মচক্রের অনেক উর্ধ্বে। বৈষ্ণবের দুঃখ কষ্ট গভীরতম কৃষ্ণ স্মরণের সুযোগ দান করে। অপরপক্ষে বদ্ধজীবের মধ্যে তমোগুণের প্রভাব এনে কৃষ্ণ বিস্মৃতি ঘটায়।

প্রশ্ন : ১০৩৩ ॥ কর্মবাদীর ভুক্তি এবং জ্ঞানবাদীর মুক্তিকে শ্রীমদ্ ভাগবত কৈতব বা অজ্ঞানতমঃ বলেছেন। কেন?

উত্তর : শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে
তাদভক্তি সুখ স্যাত কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

উপরোক্ত শ্লোক থেকে বুঝা যায় কর্মীরা যে ভোগ করতে যায় তার মাধ্যমে কখনই ভগবৎ প্রেম লাভ হয় না। আবার জ্ঞানীরা জ্ঞান এবং ধ্যানের মাধ্যমে যে মুক্তি পেতে চায় তাও মূলত ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া বুঝায়। 'পিশাচী যেমন কারোও হৃদয়ে থেকে মোহ উৎপাদন করে তেমনি ভুক্তি এবং মুক্তিও সেইরূপ ভক্তিপথে মোহ উৎপন্ন করতে পারে। এই কারণে ভাগবত ভুক্তি এবং মুক্তিকে কৈতব বা ছলমাত্র বলে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন : ১০৩৪ ॥ হরি ভজনের মূল উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : হরি ভজনের মূল উদ্দেশ্য হল হরি-তোষণ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির মাধ্যমেই হরিতোষণ হয়। সংক্ষেপে কীর্তনীয় সদা হরি—এই হল হরি ভজনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : ১০৩৫ ॥ কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল—এই কথার তাৎপর্য কি?

উত্তর : জীবের স্বরূপ ধর্ম এবং বিরূপধর্ম—এই দুই অবস্থা আছে। স্বরূপ ধর্ম হল কৃষ্ণের নিত্যদাস। কিন্তু জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি (ভগবানের অনুঅংশ) হওয়ায় অনেক সময় বিরূপ ধর্মী হয়ে পড়ে—অর্থাৎ ভগবানকে ভুলে যায়। এই অবস্থায় ভগবানের মহামায়া শক্তির প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ সে তার স্বরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণের দাসত্ব যা থেকে নিত্য আনন্দ লাভ হয় তা ভুলে গিয়ে অনিত্য আনন্দে মেতে উঠে। সে মায়ার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ার দাসত্বই স্বীকার করে।

প্রশ্ন : ১০৩৬ ॥ কে কে সদ্ গুরু পদবাচ্য হতে পারেন না?

উত্তর : নিচে কারা সদ্‌গুরু পদবাচ্য হতে পারেন না তা সংক্ষেপে বলা হল।

১. কোন জ্ঞানী (ব্রহ্ম নির্বানকামী) অথবা কর্মী সদ্‌গুরু হতে পারেন না। কারণ জ্ঞানী বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই ব্রহ্ম নির্বান অবস্থা লাভ করে। তখন সে কি করে কোন ব্যক্তির পারমার্থিক পথ প্রদর্শক হতে পারে? শব্দ ব্রহ্মইতো শিষ্যকে দান করতে হবে। কিন্তু যার সে ভূমিকায় অস্তিত্বই রইলো না সে শিষ্যকে কি মন্ত্র দান করবে। জ্ঞানী বলেন অবিদ্যা ধ্বংস হলেই কোন লোক ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে। তাহলে অবিদ্যাগ্রস্থ হয়ে সে অপরজনকে দিব্যজ্ঞান উপদেশ দিবে কি করে?

২. অনুরূপ যোগীও গুরু হতে পারেন না। কারণ সে যোগারূঢ় হলে তার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায়। এমনকি সমাধি অবস্থায়ও সে পরমতত্ত্বের ধারণা করতে পারে না। সে পরজগতের কোন শব্দকে পরিবহন করে শিষ্যকে কিছু দান করতে পারে না। তাই ভগবান ভাগবতে (১১/১২/১) বলেছেন—অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, দক্ষিণা, যজ্ঞ, তীর্থ, নিয়ম ও যম—এই সকল আমাকে জয় করতে পারে না।

৩. কর্মীও সদ্‌গুরু হতে পারেন না। কারণ তিনিতো মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎমুখী করার বদলে বরং ভগবৎ বিমুখী করে তোলেন।

প্রশ্ন : ১০৩৭ ॥ শূদ্রকুলে জাত কোন ব্যক্তি কি ব্রাহ্মণেরও গুরু হতে পারেন?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

পদ্মপুরাণেও বলা হয়েছে যদিও বর্ণ বিচার অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে তারতম্য আছে—তথাপিও এমনকি শূদ্রকূলে জন্মগ্রহণকারী পরম ভাগবত বিষ্ণুভক্ত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুরু হতে পারেন। এই কারণেই আমরা দেখি নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছ থেকেও অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন।

প্রশ্ন : ১০৩৮ ॥ ক্লীং—এই একাক্ষর মন্ত্রের তাৎপর্য কি?

উত্তর : বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে ক্লীং এর তাৎপর্য এভাবে পাওয়া যায়—

ক কারঃ পুরুষ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
ঈ কারঃ প্রকৃতি রাধা নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম-সুখং তয়োশ্চ কীর্তিতং
চুম্বনানন্দ মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ ॥

ক-কারের অর্থ : সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

ল-কারের অর্থ : শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমজনিত পরমানন্দময় সুখ সমুদ্র।

ঈ-কারের অর্থ : নিত্য বৃন্দাবনেশ্বরী পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধা নাদ ও বিন্দু—অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমানন্দময় মিলন মাধুর্য।

প্রশ্ন : ১০৩৯ ॥ কৃষ্ণতো নরদেহধারী। তাই তিনিতো আমাদের মতই কোন জীবসত্ত্বা। তাই নয় কি?

উত্তর : যে সব কৃষ্ণ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করেছেন তারা প্রথমেই বলে দিয়েছেন কৃষ্ণের পরিচয় কি—সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ—অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীর মূর্ত্তরূপ। শ্রী ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন—

প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভববামায়য়া
(গীতা ৪/৬)

—অর্থাৎ আমি আমার স্বীয় প্রকৃতি—অর্থাৎ চিৎশক্তির মাধ্যমে আমার সর্বভগৎ সত্ত্বা রক্ষা করে জগতে আবির্ভূত হই। সেখানে অ-চিৎশক্তি বা মহামায়ার কোনরূপ প্রভাব আমাতে স্থান পায় না। ভগবান কোন জীবের ন্যায় লিঙ্গ বা স্থুল শরীর দ্বারা আবৃত জীবাত্মা নন। তার দেহ-দেহী অভিন্ন। তিনি চিৎজগতের বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে যে সচ্চিদানন্দ রূপ নিয়ে বিরাজ করেন সেই নিত্য শরীর নিয়েই এই

জড়জগতে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন। এই দিব্যজ্ঞানের অভাব হেতু তাঁর সচ্চিদানন্দ মূর্তিকে অনেকে মানুষের দেহ বলে মনে করে যা একেবারেই অজ্ঞতা প্রসুত।

প্রশ্ন : ১০৪০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কখন গোষ্ঠে চলে যান?

উত্তর : শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ থেকে দেখা যায় প্রভাতে সূর্য উদয়ের ছয়দণ্ডের পর—অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট গতে কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলে যান (১ দণ্ড = ২৪ মিনিট)।

প্রশ্ন : ১০৪১ ॥ শ্রীকৃষ্ণতো জরা ব্যাধের তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। সত্য নয় কি?

উত্তর : এরূপ কথা বলাও মহাপাপ এবং ভুলেও কখনো উচ্চারণ করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ ভাগবত (১/১৫/৩৬) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, **স্বতন্বা স্বশরীরে স্বধাম প্রস্থান করেন।** আবার ভাগবতেই (১/১৪/৮) পুণরায় বলা হয়েছে ভগবানের অঙ্গত্যাগ মানেই পৃথিবী ত্যাগ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার রথের সারথি দারুককে বলেছেন, (ভাগবত ১১/৩০/৪৯) **মন্মায়ার চিতমেতাং—অর্থাৎ** আমার এই মৌষল লীলা এবং অন্তর্ধানলীলা অসুর বিমোহনের জন্য মায়া কল্পিত।

মৌষল লীলা অভিনয় করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য পার্ষদ যাদবদেরকে স্বশরীরে স্বধামে প্রেরণ করলেন এবং যেসব দেবতাদের যাদবদের মধ্যে আবেশ হয়েছিল তাঁদেরকেও পঞ্চভৌতিক দেহ পতন করে আপন আপন স্বর্গে প্রেরণ করেন। তারপরও ভগবান এক লীলার অভিনয় করেন যাকে চর্ম অথবা জড় চক্ষে মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করেন জরাব্যাধের তীরবিদ্ধ হয়ে ভগবান ধরাধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ তাঁদের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন যে স্বশরীরে ভগবান তাঁর গোলোক ধামে গমন করলেন। অথচ মূঢ় ব্যক্তিগণ ভাগবত পড়েও **স্বতন্বা** (ভাগবত ১/১৫/৩৬) শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না। উলুকে (পেঁচা) কি দেখে সূর্যের কিরন?

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হয়েকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।